Stockholm Sarbojonin Puja Committee LIKHON 2023

স্টকহোল্ম সার্বজনীন পূজা কমিটি

লিখন

শারদীয়া সংখ্যা

একাদশ বর্ষ ১৪৩০

Sweety

প্রচ্ছদ কল্পনা

প্রকৃতির কানায়, বিষয়গুলি শুনুক,
আমাদের অবস্থানে এসেছে এক বিপদ।

বৃষ্টির জলে, শব্দের বন্ধন,
বনের জীবনে, শয্যায় প্রাণ।

প্রদূষণে বাতাসে, স্বাস্থ্যের ধারায়,
কাঁপছে প্রকৃতি, অসহ্য হৃদয়ে।

প্লাস্টিকে লক্ষ লক্ষ ভূতর,
আবারও কাছাকাছি ভাসছে সূর্য।

আমাদের প্রতি ক্ষণ, বদলে যাচ্ছে রূপ,
কী ভুলে যাচ্ছি, বলুন একটুখানির চুপ।

প্রকৃতির কাছে শৃংগার, রঙিন হাসি,
মিলন হোক সবার সঙ্গে, বৃষ্টি আর ভালোবাসা।

In nature's ears, let's speak of matters,
A peril has arrived at our doorstep.

In the rain's water, a bond of sound,
In the forest's life, breathes in the shade.

In polluted air, in the stream of health,
Nature trembles, intolerable in the heart.

In the multitude of plastic ghosts,
Once again, the sun is setting nearby.

Every moment for us, changes form,
What are we forgetting, let's speak a bit.

To nature, a romance, a colorful smile,
Let there be a union with everyone, rain and love.

স্টকহোল্ম সার্বজনীন পূজা কমিটি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা নির্ঘন্ট বঙ্গাব্দ ১৪৩০

এই বছর দেবী ঘোড়ায় করে মর্ত্যে আসবেন ও ঘোড়াতেই বিদায় নেবেন।
এর ফলে বাড়বে সামাজিক অস্থিরতা।

Stockholm sarbojonin puja committee (SSPC)
Sree Sree Durgapuja Nirghonto 2023

অধিবাস, বোধন ও ষষ্ঠী 20th Oct, **২'রা কার্তিক** Friday, **শুক্রবার**	17:00 :Puja (Adhibas,Bodhon o Shosthi) 18:30 : Cultural Program 20:00 : Bhog Prasad
সপ্তমী ও মহাঅষ্টমী 21st October, **৩'রা কার্তিক** Saturday, **শনিবার**	10:30 : Puja 13:00 : Pushpanjali 13:30 : Bhog Prasad 16:00 : Cultural Program 17:30 : Sandhi puja 18:30 : Cultural Program 20:00 : Prasad Bhog
নবমী ও বিজয়া দশমী 22nd October, **৪'ঠা কার্তিক** Sunday, **রবিবার**	12:00 : Puja 13:30 : Pushpanjali 14:00 : Bhog Prasad 15:30 : Cultural Program 16:30 : Sindoor khela 18:00 : End of the event

সূচীপত্র Content

প্রবন্ধ

পৃ - ২ বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণী
P - 3 Message from Ambassador of India
P - 4 Indier bidrar mycket till Sveriges utveckling – *Nima Gholam Ali Pour*
পৃ - ৬ প্রবাসে মাতৃ আরাধনা - *প্রিয়রঞ্জন ভকত*
পৃ - ৮ গয়াতীর্থে পিণ্ডদান কেন ? - *বিষ্ণু চক্রবর্তী*
পৃ - ১১ যুদ্ধের মাঝে যখন দুন্নি আসে - *সুচন্দ্রা ঘটক*
পৃ - ২২ চারুকেশী - *ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক*
পৃ - ৩৭ সিনেমার মতো বাস্তব - *সায়ন্তন মিত্র (Kolkata Police)*
পৃ - ৪৪ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বৎসর পূর্তি– সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা – *স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ*
পৃ - ৪৭ ঠিকানা - *সুচরিতা সেন চৌধুরী*
পৃ - ৫৭ দুর্গোৎসবের পরিবর্তন - *শৈলেন্দ্রনাথ মৈত্র*

কবিতা

পৃ - ১৪ লড়াই - *শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়*
পৃ - ২০ থাকবে মনে - *আরণ্যক বসু*
পৃ - ২১ দিনলিপি - *সমরেন্দ্র কুমার দত্ত*
পৃ - ৩০ ফেলে আসা দুর্গা পূজা - *মৌমিতা ঘোষ*
পৃ - ২৬ আগুন - *রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়*
P - 40 Fragments - *Ashani Chakraborty*
পৃ - ৪২ পুনর্মিলন - *মৌমিতা ঘোষ*
পৃ - ৫৪ লোভী - *শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়*

ভ্রমণ

পৃ - ১৫ আফ্রিকার জঙ্গলে রাজার মুখোমুখি - *সুপর্ণা সান্যাল*
পৃ - ৩১ সুমেরু কথা - *অয়ন চক্রবর্তী*

প্রণালী

পৃ - ৫৫ মালপোয়া - *ঝর্ণা সিংহ*
পৃ - ৫৬ গোকুল পিঠে - *ঝর্ণা সিংহ*

Front Cover By
Sweety Bhattacharyya

Likhon designed By
Sayan Dutta

LIKHON is a yearly puja magazine of Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC), Sweden. It's distributed free by SSPC. The writing and artwork herein were produced for SSPC LIKHON. The opinions in the articles are entirely the thoughts and views of the respective authors only and not that of SSPC. No copyright infringement is intended in Likhon 2023

সম্পাদকীয়

আশ্বিনের শারদপ্রাত এদেশে অন্যভাবে আসে। বছরের এই সময়টা যখন হাঁটতে শুরু করে শেষের দিকে, বাঙালি মন খোঁজে রং , উত্তর মেলে প্রকৃতি মায়ের অবলীলা আশ্রয়ে। প্রকৃতির সাথে সাথে বাঙালি তৈরি হয় তার বার্ষিক পুজো যাপনের জন্য , তার আস্থা আছে মা ত্রীনয়নীর সোনার কাঠি রুপোর কাঠির ওপর। 'আস্থা'- অভিধান দেখলে এই কথার অনেক মানে 'আলম্বন, স্থিতি , প্রত্যয় , প্রতিষ্ঠান' । বাঙালির দুর্গাপুজো কি এগুলোর সবকিছুই নয়। না হলে সুমেরুর নিকটবর্তী এক শহরের সাব-আর্বের একটা স্কুলের প্রেক্ষাগৃহ তিন দিনের জন্য কি করে হয়ে ওঠে অর্চণাগৃহ। সেখানে মা ত্রিনয়নী কেন্দ্র থেকে যেন আয়োজন করেন বন্ধুত্বের অর্চনার আর রচনা করেন সামাজিক ঐক্যের। সুখ-দুঃখ আরি ভাব দৈনন্দিন সাপ লুডর খেলা ভুলে মানুষ-সমাজ শারদ-যাপন করে একসাথে । ষষ্ঠীর বোধন থেকে বিজয়ার সিঁদুর খেলা, মা যেন দশ হাতে আগলে রেখেছেন সবটুকু। যে দশ হাতে শুধু ভয়ানক অস্ত্রগুলো নিয়ে মা যাননি যুদ্ধে , সাথে ছিল রত্নহার , অক্ষমালা ও কমন্ডলু। যেগুলো দিয়ে একটা সৌন্দর্য , শান্তি , শ্রী সম্পন্ন হয়। আমাদের জীবনের ছোট বড় যুদ্ধগুলোতে যাওয়ার সময় যেন মনে রাখি আমরা জেতার জন্য শুধু ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহার না করে সৌন্দর্য শান্তি ও শ্রী ব্যবহার করেও বহু যুদ্ধ জয় করা যায়। এর সাথেই যেন মিলে যায় লিখন-এর অপরিহার্যতা। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি শারদ উৎসবের এক অপরিহার্য অঙ্গ কেন ? একটা রেডিওর অনুষ্ঠান দিয়ে একটা জাতির শ্রেষ্ঠ পুজো শুরু হচ্ছে এরকম ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে কি ? প্রতিবছর মহালয়ার ভরে মহিষাসুরমর্দিনী মা নিজ হাতে যেন এঁকে দেন লিখনের ললাট-লিখন। এই শারদ পত্রিকা কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ পাই আমরা। ১১ বছরের লিখন জীবন কে আরো দীর্ঘজীবী করার প্রত্যয় নিয়ে চলুন শুরু করি এ বছরের লিখন যাপন। যারা লিখন কে সমৃদ্ধ করেছেন গত ১১ বছর ধরে এবং যারা লিখন কে এবছর সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের অনেক ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছাসহ

জয়দীপ ব্যানার্জি
অয়ন চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

Ambassador

EMBASSY OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
ANDERSTORPSVAGEN 12 (1 TR.)
SE-171 54 SOLNA, SWEDEN
TEL: +46 8 730 58 50 -52
FAX: +46 8 730 58 70

নং: ১৯.০১.৪৬০১.৫০৫.৯৮.৯১৮.২১-৪৪৩

তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ও প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। শারদীয় এ উৎসব পুরো দেশজুড়ে নিয়ে আসে সম্প্রীতির বার্তা। কাল পরিক্রমায় এ উৎসব হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।সমাজে অন্যায়, অবিচার ও অসুরশক্তি দমনের মাধ্যমে শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শারদীয় দুর্গাপূজা করে থাকেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও দেশে ও প্রবাসে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দূর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় থেকে দূরে রাখে এবং শান্তির পথ দেখায়। শারদীয় দুর্গাপূজায় ঐক্য, সৌহার্দ্য, ন্যায় ও সম্প্রীতির শক্তিকে ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা বিনির্মাণে সম্মিলিত ভাবে কাজ করবো- এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করেছে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'এ আপ্ত বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদার ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সার্বজনীন এ পূজা বিদেশে আয়োজন প্রবাসীদের জন্য নিঃসন্দেহে অনেক কষ্টসাধ্য যা প্রতিবারের ন্যায় আয়োজন করায় আয়োজকদের এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ড- এ বসবাসরত সকল বাঙালি ভাই-বোনদের প্রতি রইলো আমার শারদীয় দূর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মেহ্‌দী হাসান
রাষ্ট্রদূত

Embassy of India
Stockholm

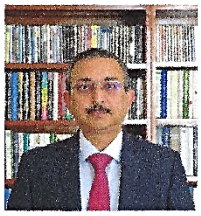

Message
from
Ambassador of India to Sweden & Lativa

Warm greetings on the auspicious occasion of Durga Puja.

It is great to see this popular and joyous Indian festival being celebrated so enthusiastically in Sweden.

Maa Durga is both a mother and a warrior who protects humanity from evil. The worship of Goddess Durga is the worship of the divine feminine form and qualities. This is a unique and integral part of our millennia old civilizational legacy.

In these difficult and challenging times, the message of Durga Puja is of eternal hope. It reminds us of the abiding strength of positivity over negativity and that the forces of good will always prevail.

That is why, every year Durga Puja is eagerly awaited and enthusiastically celebrated by the young and old alike. It is good to see the colourful and elaborate ceremonies and rituals bringing together devotees in Sweden.

I compliment the Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC) for their initiatives to celebrate festivals and cultural events with the participation of community and especially the younger generation.

My best wishes to all of you on this festive occasion.

Tanmaya Lal

Indier bidrar mycket till Sveriges utveckling

Nima Gholam Ali Pour

Member of Parliament in Sweden's Riksdag for the Sweden Democrats

Hej kära vänner!
Först och främst vill jag tacka för att ni bjudit hit mig.
Jag heter Nima Gholam Ali Pour och är riksdagsledamot i Sveriges riksdag för Sverigedemokraterna.
Jag bor i Malmö och brukar arbeta med migrationsfrågorna i riksdagen även om jag har ett stort intresse för internationella frågor.
Jag hoppas festivalen har varit trevlig.
Personligen har jag ingen djupare erfarenhet från Indien.
Jag tror inte det räknas om man har sett några indiska filmer och ätit indisk mat.
Däremot vet jag att indier bidrar mycket till Sveriges utveckling. Och det är viktigt.
Sverige och Indien har en stark relation som sträcker sig över olika områden, inklusive ekonomi och handel.
Indier och indiska företag har spelat en betydande roll i att forma och stärka Sveriges ekonomi på flera sätt.
För det första har indiska företag i många branscher, som teknik, läkemedel, och telekommunikation, investerat och etablerat sig i Sverige.
Dessa investeringar har inte bara skapat arbetstillfällen för svenskar, utan också bidragit till teknisk innovation och kunskapsutbyte.
Indiska företag har visat sig vara en källa till högteknologisk expertis och kapital som har berikat svenskt näringsliv.
För det andra har indiska entreprenörer och affärsfolk i Sverige drivit företag och startat upp framgångsrika verksamheter.
Deras företagande har bidragit till att skapa arbetstillfällen och tillväxt i svenska städer och regioner. Indiska företag har också aktivt främjat handelsrelationerna mellan länderna genom att exportera svenska produkter och importera indiska produkter till Sverige.
En annan aspekt att betona är det ömsesidiga utbytet mellan Sverige och Indien. Sverige har investerat i Indien och bedriver affärsverksamhet där, vilket i sin tur skapar ömsesidiga fördelar för båda länderna. Denna typ av samarbete ger ökad affärsutveckling och teknologisk innovation för att möta dagens globala utmaningar och stimulera ekonomisk tillväxt.
Kort sagt, det positiva bidraget från indier och indiska företag till Sveriges ekonomi är omfattande och betydande. Era investeringar, affärsverksamhet och entreprenöriella ansträngningar har stärkt Sveriges näringsliv, skapat arbetstillfällen och bidragit till ekonomisk tillväxt.
Denna samverkan har främjat ömsesidiga intressen och fördelar för både Indien och Sverige.
Låt oss fortsätta att uppmuntra och stödja samarbetet mellan Indien och Sverige och främja ytterligare ekonomisk tillväxt och välstånd för båda nationerna. Tillsammans kan vi skapa en starkare och mer framgångsrik framtid.
Till sist, det går inte att bortse från den fantastiska resa som Indien och det indiska folket har gjort.
Man har visat att ett land i Sydasien kan under ett demokratiskt styre utvecklas och bli en av världens mäktigaste länder.
Den resan, från att ha varit en brittisk koloni, till att idag vara ett av världens mest inflytelserika länder, är en resa som väcker hopp hos många i världen att det som en gång raserades kan alltid byggas upp, även om det tar en viss tid.
Idag är det mycket dystra rubriker i medierna här i Sverige och människor behöver nog höra

framgångshistorier som Indiens framgångshistoria för att förstå att det går att komma tillbaka och blomstra som nation även om det ta kan lite tid.
Indiens fantastiska kultur lyckades övervinna kolonisering och imperialism och idag så sprids den indiska kulturen i världen och vi får alla ta del av denna rika civilisation.
Och på det sättet är Indien en inspiration för många länder.
Åter igen, tack för att ni bjöd in mig och jag hoppas att vi ses igen.

প্রবন্ধ

প্রবাসে মাতৃ আরাধনা

প্রিয়রঞ্জন ভকত

দেখতে দেখতে শারদীয়া দুর্গা পূজা ২০২৩ দোরগোড়ায় আগত যদিও মল মাসের (একই মাসে দুটি অমাবস্যা) কারণে পুজো গতবারের থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ পিছিয়ে সপ্তমী ২১শে থেকে দশমী ২৪ শে অক্টোবর পালিত হবে। সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি' তাই শুক্রবার ২০-এ অক্টোবর থেকে রবিবার ২২ শে অক্টোবর অবধি স্টকহোলম সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির (SSPC) উদ্যোগে ত্রিদিবসীয় শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা য়ারফালা (Jarfalla)জিমনাসিয়াম প্রাঙ্গণে উদযাপিত হবে। অনন্যোপায় হয়ে 'মা' স্বামীগৃহে কৈলাসে ফিরে যাওয়ার আগে আমাদের বিদায় বিসর্জন রবিবার জানাতে হবে। অবশ্য 'মা'কে আমরা আগেই আবাহন করছি।

দীর্ঘ দশ সপ্তাহ গ্রীষ্মাবকাশের পর আগস্ট এর মাঝামাঝি থেকে স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে প্রচণ্ড গরমে এত লম্বা ছুটি কেন? Scandinavia-র দেশগুলিতে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। যদিও গত কয়েক বছর পরিবেশ দূষণের কারণে গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হয়েছিল। আয়োজক ও ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবীদের ছুটি নেওয়া সম্ভব, বিদ্যার্থীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সেই কারণে পূজার দিনে পূজা করা বিদেশে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আরেকটা লক্ষ্য থাকে যে, উত্তরসূরীদের আমাদের সংস্কৃতি ও উৎসবের সঙ্গে পরিচিত করা, সেটি সেক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

বিদেশি শক্তি যারা ভারতকে বারে বারে আক্রমণ করেছে, তারা ভারতে বসবাসকারীদের হিন্দু নাম দিয়েছে। কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রে হিন্দু কথাটি উল্লেখ নেই বরং সনাতন ধর্ম (Eternal path)উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম হচ্ছে একটা পদ্ধতি যা অনুসরণ করে বাস্তব (Ultimate Reality) ও সত্য (Absolute truth) জানা যায় । ঋষি মনু বলেছেন: যা মানুষকে সুখের পথে নিয়ে যেতে পারে না এবং যা মানুষের পরিপন্থী তা ধর্ম হতে পারে না।

হিন্দু বা সনাতন ধর্ম ৭০০০ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। সময় ,পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে মানিয়ে চলেছে। সামাজিক মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে চলায় হল হিন্দু ধর্ম পালনের চাবিকাঠি।

সারা ভারতে ও বাংলাদেশে দুর্গাপূজা হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। দুর্গাপূজা- এই একটা শব্দের দ্যোতনা বাঙালি জাতিকে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণবন্ত করে তোলে।এই কথার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ছুটি ও আনন্দের গন্ধ।

শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে দুর্গাপূজা প্রচলনের কথা জানা যায়। দুর্গাপূজার সময় তাই চণ্ডীপাঠ আবশ্যিক। শ্রীশ্রীচন্ডী আবার 'মার্কন্ডেয় পুরাণ' নামে একটি পৌরাণিক বইয়ের অংশ। এতে ১৩ টি অধ্যায় ও ৭০০ টি শ্লোক আছে। এই বইয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ, মধু-কৈটভ ও মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে । শারদীয়া দুর্গাপূজা হলো রামায়ণের

শ্রীরামচন্দ্রের দেবীর অকালবোধন। অশুভ শক্তি রাবণকে পরাজিত করার জন্য ১০৮টি দুষ্প্রাপ্য নীল পদ্মের সহযোগে দেবীর কৃপা প্রার্থনায় আরাধনা করে বর চেয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র।

দুর্গাপূজা ২০২২ ছিল SSPC উদ্যোগে দশম বার্ষিক পূজা। ঐ বছরের পূজাটিকে একটি মাইল ফলক ধরে, বিশেষভাবে পালনের উদ্যোগ বহু আগে থেকে নেওয়া হয়। মঞ্চের সাজ-সজ্জার জিনিস বহু আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করে আনানো হয়েছিল।

অন্যান্য বৎসরের মতো তিনদিনই বহু জনসমাগম হয়। ভারতীয় ও বাংলাদেশ দূতাবাসের রাজদূতদ্বয় পূজা প্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ দেন এবং বিদেশের মাটিতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। সদ্য সমাপ্ত ভোট প্রক্রিয়ার (সুইডেনের প্রতি চার বছরে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় রবিবার তিনটি পর্যায়ের ভোট এক সঙ্গে হয় - জেলা, রাজ্য ও দেশ) বিজয়ী সোসালডেমোক্রেট পার্টির লোকসভার সদস্য(Riksdagsledamot) Christopher Lindvall ভারতীয় সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।সুইডেনের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ভারতীয়দের অবদানের কথা স্বীকার করেন।

পূজা প্রাঙ্গণে খাবার, বই ,সাজ-সজ্জা, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় জিনিসের প্রদর্শনী ছিল। উভয় দেশের রাজদূত প্রদর্শনীগুলি দেখেন এবং ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন।

তিনদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, ক্যুইজ ,লটারি ও অন্যান্য জিনিস ও প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। বিভিন্ন সন্ধ্যায় রাজদূতরা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং এই অনুষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও উপযোগিতার কথা বলেন। উভয় রাষ্ট্রদূতকে শারদীয়া পত্রিকা 'লিখন' এ শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং একটি করে সংখ্যা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে তিনদিন সকল উপস্থিত ব্যক্তিকে প্রসাদ,দ্বিপ্রাহরিক ও নৈশ আহারে আপ্যায়িত করা হয়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দ সহকারে খাবার গ্রহণ করেন এবং বিপুল আয়োজন ও আর্থিক দায়ভারের খোঁজখবর নেন। এখানে উল্লেখ্য SSPC সুইডেন সরকারের থেকে কোন আর্থিক আনুকূল্য নেয় না এবং ভারতীয় দূতাবাস থেকেও আর্থিক সাহায্যে আবেদন করে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা দেন তাদের দান এবং কমিটির সদস্যদের আর্থিক বদান্যতায় এই প্রয়াস এখনো অটুট রয়েছে।

পুজোতে যোগদানের জন্য নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কিন্তু কোন চাঁদা বাধ্যতামূলক নয়। এই পূজাতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ যারা আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানান।

য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন ন সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।

মাতৃ চরণে সকলের সুস্থ, সবল, নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করলাম।

প্রবন্ধ

গয়াতীর্থে পিণ্ডদান কেন ?

বিষ্ণু চক্রবর্তী

ভাদ্রপূর্ণিমা শেষ করে প্রেতপক্ষ বা পিতৃপক্ষের পক্ষকাল শেষ হয়েছে মহালয়া অমাবস্যায়। সমস্ত পরলোকগত আত্মাদের একপক্ষকাল ব্যাপী তিল,জল,ফুল অর্পণ করে তর্পণকর্ম শেষ হয়েছে মহালয়া অমাবস্যায়। তারপর দেবীপক্ষ শুরু হয়ে ভগবতী দুর্গাদেবীর স্বপরিবারে আগমনে আমরা সবাই উৎফুল্ল। চলছে বিশ্বব্যাপী দশভূজা মায়ের আরাধনা। নর্থেউরোপের স্টকহলম শহরে প্রতি বছরের মত এবারও স্টকহলম সার্বজনীন পূজা কমিটি দ্বারা মায়ের অর্চনা চলছে মহাআড়ম্বরের সঙ্গে। পূজা ম্যাগাজিন ছাড়া পূজা যেন অসম্পূর্ণ তাই এবারও বেরোলো পূজা ম্যাগাজিন লিখন। প্রতি বছরই আমি পূজা ম্যাগাজিনে কিছু লিখি এবং সেটা প্রসঙ্গতই পূজা পার্বণ নিয়ে তাই এবছরও তার ব্যতিক্রম হলোনা।

আমার প্রবাস জীবনে দীর্ঘ ৪৩ বছর অত্রিক্রম হল (ইউরোপে). চাকুরী ঘর সংসার সবকিছু সামলিয়ে পূজাপার্বনে পুরুহিত্যও রক্ষা করে চলছি। অবশ্য এর সবকিছুর পেছনে রয়েছে সকলের ভালোবাসা। আমাকে পূজাপার্বনে সকলে ডাকে বলেই আমি পুরোহিত। সেই শৈশব কাল থেকেই বিভিন্ন পূজা পার্বণ নিয়ে অনেক কৌতুহল ছিল, ছিল অনেক ধরণের প্রশ্ন। যেমন ২ ধরণের গণেশ মূর্তি কেন ? দেব গণেশের একটি দাঁত ভাঙা কেন ? সরস্বতী পুজোর আগে কেন কুল খেতে নেই , হাতেখড়ি কেন , কেন সরস্বতী পুজোর দিন পড়াশোনা করা যাবে না ? কেন পরলোকগত আত্মার পিণ্ড গয়াতীর্থে দিতে হবে ? আরও অনেক কেন কেন ? পুরোহিত মশাইর চোখ রাঙানির পর কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতাম আর কিছু প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই থেকে যেত। বেপারটা এমন ছিল যে, `মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার, সবাই বলে মিথ্যে বাজে বকিসনা আর খবরদার।' বাবা বলতেন 'ছোটদের এতো কিছু জানতে নেই, আর যিনি পূজারী তার এত সময় কোথায় যে সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। বড় হও তারপর নিজ চেষ্টায় সব জেনে নিও। '

এখন বড় হয়েছি আর মনের অদম্য ইচ্ছার যে প্রশ্ন গুলির উত্তর পাই নাই সে গুলি জানার চেষ্টা করছি। আর সুযোগ পেলেই যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন পূজা পার্বণে বলার চেষ্টা করি। তাই এবার পুজো ম্যাগাজিনে গয়াতীর্থ নিয়ে লেখার প্রয়াস হল।

সুরাসুর তথা দেবতা ও অসুর সবাই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি। তবুও এই দুইটি পক্ষ ধর্মের দুই মেরুর দুইটি পক্ষকে নির্দেশ করে। এর মধ্যে দেবতারা হলেন সৃষ্টির বিকাশ সাধনকারী এবং অসুরগণ হচ্ছে সৃষ্টির বিনাশকারী। তাই অসুর বলতেই আমাদের মনে উঁকি দেয় বিকটদর্শন, নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ ও পাপাশ্রয়ী কিছু অবয়ব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যোগেও অসুর ছিল এবং এই কলিযোগেও অসুর আছে। শান্ত নিরীহ ধর্মপরায়ণ লোকদের ধর্ম কর্মে বাঁধা দেয়াই এই অসুরদের প্রধান কাজ। তাইতো এই সভ্য যোগেও প্রতিমা ভাংচুর ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে এই সব নরাসুরদের পাপাশ্রয়ী মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। আর নিরীহ ধর্মপরায়ণ মানুষদের মনোকষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

দেব যুগের সব অসুর সমান ছিলনা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এমনই একজন অসুর ছিলেন গয়াসুর। পিত ত্রিপুরাসুর ও মাতা প্রভাবতী সুরের পুত্র ছিলেন গয়াসুর। অন্যমতে গয়া ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্টি, অর্থাৎ তার কোন জাগতিক পিতা মাতা ছিল না এবং একারণেই তার মধ্যে কোন আসুরিক প্রবৃত্তিও ছিল না। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। যিনি সহস্র বছর তপস্যা করে তার শরীরকে অত্যন্ত শুদ্ধ করে তুলেছিলেন। যার মহান আত্মত্যাগের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গয়াক্ষেত্রে এবং তার পরহিত ব্রতের কারণেই গয়াতে পিণ্ডদান করলে পিণ্ডদানকারী সহ তার পূর্বোক্ত সাত পুরুষের মুক্তি ঘটে।

সনাতন ধর্মের পবিত্র তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গয়াতীর্থ। তাই সনাতন ধর্মাঅবলম্বীরা তাদের পিতৃ - মাতৃ ঋণের শোধার্থে তথা পিতৃপুরুষের পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনার জন্য পিণ্ডদান করতে গয়াতে যান। এছাড়াও গয়া মানে চিরকাঙ্ক্ষিত চীরবিস্ময় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম। এজন্য গয়াকে বিষ্ণুক্ষেত্রও বলা হয়ে থাকে। সুপ্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণে ও মহাভারতেও গয়ার

উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে রাম, সীতা ও লক্ষণ গয়ায় পদার্পন করেছিলেন রাজা দশরথের পিণ্ডদান করার উদ্দেশে। অন্যদিকে মহাভারতে গয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে গয়াপুরী নামে। এই গয়াপুরী যার নামে আজও বিখ্যাত ,তিনি হলেন গয়াসুর। বায়ুপুরাণের গয়ামাহাত্য পাঠে জানা যায় এই গয়াসুরের মহান আত্মত্যাগের কাহিনী। অসুর কুলের মধ্যে গয়া ছিল মহাবলি ও মহাপরাক্রমশালী। তার শরীরের দৈর্ঘ ছিল ১২৫ যোজন, আর স্থুলতা ছিল ৬০ যোজন। তবে তার শরীর যতই বিশাল হোক না কেন, আচরণে তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত।

এই গয়াসুরের মনে সর্বদাই একটা কথা তাড়া করে বেড়াত যে,যদিও তার প্রবৃত্তি অসুরদের মত নয়,কিন্তু অসুরকুলে জন্ম নেওয়ার জন্য তিনি হয়তো স্বর্গলাভ করতে পারবেন না। এবং কেউ তাকে সম্মানের চোখেও দেখবে না। তাই মুক্তি লাভের জন্য তিনি কোলাহল পর্বতের চূড়ায় বসে শুরু করলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কঠোর তপস্যা। কেটে গেল শত সহস্র বছর, তবুও তপস্যা করেই চললেন গয়াসুর। তার এমন তপস্যা দেখে শংকিত হলেন দেবতারা কারণ গয়াসুর যদি দুর্লভ কিছু চেয়ে বসেন বিষ্ণুর কাছে। যুগ যুগ ধরে অসুররা তো ঠিক এই কাজটিই করে এসেছেন। প্রথমে তারা ত্রিদেবের যে কোন একজনকে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করেছেন আর বর প্রাপ্তির পরেই শুরু হয়েছে তাদের তান্ডব, এরপর মহা সংগ্রাম করে পরাজিত করতে হয়েছে সেই অসুরকে। সুতরাং দেবতাদের এই শঙ্কা মোটেও অমূলক নয়। তাই তারা প্রথমই গেলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে, খুলে বললেন গয়াসুরের কঠোর তপস্যার কথা, অনুরোধ করলেন কিছু একটা করতে। দেবতাদের শঙ্কাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ব্রহ্মা চললেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুও শুনলেন দেবতাদের শঙ্কার কথা। তারপর সবাই মিলে উপস্থিত হলেন কোলাহল পর্বতে, গয়াসুরের তপস্যা স্থলে। শ্রীবিষ্ণু গয়াসুরকে তার তপস্যা ভঙ্গ করে বর চাইতে বললেন। গয়াসুর বললেন ``হে প্রভু আমি আপনার কাছে স্বর্গ, রাজ্য,ঐশ্বর্য বা অমরত্ব চাইনা। আপনি যদি সত্যই আমাকে বর প্রদান করতে চান তাহলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে,আমার শরীর যেন কোন ব্রাহ্মণতীর্থস্থান,দেবতা,মন্ত্র,যোগী,সন্ন্যাসী,ধর্মী,কর্মী, জ্ঞাতি প্রভৃতি সকল পবিত্র পদার্থ থেকেও যেন পবিত্র হয়।¨ গয়াসুরের প্রার্থনা শুনে অত্যান্ত প্রীত হলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তিনি খুশিমনে গয়াসুরকে তার অভীষ্ট বর প্রদান করে বৈকুন্ঠে গমন করলেন। অন্যদিকে দেবতারাও শংকামূক্ত হলেন। তারাও গয়াসুরের এমন বর প্রার্থনায় ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

তবে সমস্যা শুরু হোল একটু অন্যরকমভাবে। গয়াসুর ছিলেন যেমন ধার্মিক তেমন পরোপকারী। বিষ্ণুর বরে যখন তার শরীর ভীষণ শুদ্ধ হল তখন তিনি বেড়িয়ে পড়লেন নগর ভ্রমণে। তার শরীরের দর্শণ - স্পর্শণে তার চার পাশের সমস্ত প্রাণিকুল পবিত্র হয়ে বৈকুন্ঠে গমন করতে থাকল। এভাবে একে একে শুন্য হতে লাগলো শহর, নগর,লোকালয়। শত সহস্র পাপ করেও বৈকুণ্ঠবাসী হতে শুরু করলেন সবাই। এ দৃশ্য দেখে আবারও চিন্তায় পড়লেন দেবতারা। তবে সবার চেয়ে বেশি চিন্তিত হলেন যমরাজ। কারণ গয়াসুরের শরীরের কল্যাণে একটি প্রাণীও যমের বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না। এখন উপায়? সৃষ্টির আমোঘ নিয়ম তো এভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে না। পাপ পুণ্যের ফল তো সবারই ভোগ করা উচিত। উপায়ন্তর না দেখে যমরাজ শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মার। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন,´গয়াসুরকে এখনই থামাতে না পারলে বিধির লিখনে পরিবর্তন হয়ে যাবে। প্রত্যেকের তার কর্মফল অনুযায়ী ফল ভোগ করার প্রথা সমাপ্ত হয়ে যাবে। পাপীরাও স্বর্গের অপার সুখ ভোগ করতে শুরু করবেন। ব্রহ্মা যমরাজের বক্তব্যের যথার্থতা মর্মে মর্মে উপলব্দি করলেন।

এরপর ব্রহ্মা আবারও দেবতাগনদের নিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীবিষ্ণুর নিকট। ভগবান বিষ্ণু এই সংকট থেকে পরিত্রান পাবার জন্য ব্রহ্মাকে একটি যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। তবে এই যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন একটি পবিত্র দেহ। যেহেতু নারায়ণের বরে গয়াসুরের দেহ ছিল সবচেয়ে পবিত্র তাই পবিত্র দেহ খুঁজে পেতে কোন কষ্ট হয়নি দেবতাদের। এরপর ব্রহ্মা গয়াসুরের কাছে গিয়ে তার দেহটি জগতের কল্যানে চাইলেন। গয়াসুরও সানন্দে জগতের কল্যানে তার দেহ দান করলেন।শুরু হল যজ্ঞানুষ্ঠান। গয়াসুর যোগ বলে তার দেহ বিস্তার করলেন। কোলাহল পর্বতে মাথা বাজপুরে নাভিদেশ, আর শ্রীক্ষেত্রে রাখিলেন চরণ। বলা হয় ব্রহ্মা তার নাভিতে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। যজ্ঞের শুরুতে ব্রহ্মার আদেশে ধর্মশীলা এনে রাখা হয় গয়াসুরের শরীরের উপর। এরপর সকল দেবতারা সেই ধর্মশীলায় আরোহন করেন গয়াসুরকে পিষ্ট করে তার থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। গয়াসুরের পবিত্রদেহ ঠিক আগের মতই সবল রইল। সংবাদ পৌঁছাল শ্রীবিষ্ণুর কাছে। তিনি গদাধররূপে হাজির হলেন গয়াসুরের সম্মুখে। এরপর প্রথমে গয়াসুরের দেহ গদাঘাত করলেন এবং পরে

সকল দেবতাদেরকে নিয়ে গয়াসুরের শরীরের উপর স্থাপিত সেই ধর্মশীলায় আরোহন করলেন। কিন্তু ফলাফল সেই শুন্য। গয়াসুর নির্বিকারভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন দেবতাদের এসব কর্মকান্ড। তারপর একসময় বলে উঠলেন ´´হে দেবগন, আমি আমার নিষ্পাপ দেহ ব্রহ্মার যজ্ঞে দান করার পরেও আমার প্রতি এত নির্যাতন কেন ?শ্রীহরি একটিবার আদেশ করলেই তো আমি নিশ্চল হয়ে যেতাম। আপনারা আমাকে বঞ্চিত করে এতবড় যজ্ঞানুষ্ঠান কেন করলেন?´´

দেবগন গয়াসুরকে পিষ্ট করতে এতসব আয়োজন করেছেন। তাদের প্রতি গয়াসুরের এমন বিনয়বাক্য দেখে করুণায় গলে গেলেন দেবতারা। তারা গয়াসুরের এমন মহানুভবতায় তাকে আবারও বর চাইতে বললেন। গয়াসুর চাইলেন ``যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন এই শিলায় শ্রীবিষ্ণুসহ সকল দেবগন অধিষ্টান করবেন। এই স্থান আমার নামানুশারে একটি পূর্ণ্যক্ষেত্র মহাতীর্থে পরিণত হবে। এখানে আমার শরীর যে পাঁচ ক্রোশ জায়গা জুড়ে স্থিত হয়েছে তা গয়াক্ষেত্র নামে এবং আমার মস্তক যে একক্রোশ জায়গা জুড়ে স্থিত তা গয়াশির নামে পরিচিত হবে। এই তীর্থক্ষেত্র সকল প্রকার তীর্থের থেকে শ্রেষ্ট হিসেবে পরিগণিত হবে। এছাড়াও এই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করলে শ্রদ্ধকারী ও তার সাত পূর্ব পুরুষ ব্রহ্মলোকে গমন করবে।´´গয়াসুর নিজের মৃত্যুর বিনিময়েও পরের এমন উপকারের কথা ভাবতে পারেন দেখে বিস্মিত দেবতাগণ, তাকে আশির্বাদ করলেন এবং তার চাওয়া বর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হওয়ার বর প্রদান করলেন। এরপর গয়াসুরের শরীর নিশ্চল হয়ে নীল হয়ে রইল বর্তমান গয়াতীর্থ নামক স্থানে।

সেখানে ভগবানের আশীর্বাদে সকল জীবের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হল। এখানে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলে তার মুক্তি লাভ হয়। এরপর থেকে গয়াতে পিণ্ডদান করার রীতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে। এছাড়াও গয়াসুরের স্মৃতিহেতু এখানেই রইল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন অংকিত ধর্মশীলা । ফল্গু নদীর কাছেই সেই বিষ্ণুপাদপদ্মকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত বিষ্ণুপদ মন্দির। অভূতপূর্ব সেই পাদপদ্ম। সেখানে সকলেরই মস্তক ছোঁয়ানোর অধিকার আছে। কেউ সেখানে সহস্র তুলসী অর্পণ করছেন আবার কেউবা ব্রাহ্মণ দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিয়ে সঙ্কল্পপূবর্ক তুলসীদান করছেন। অমোঘ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরমধাম এই বিষ্ণুপাদপদ্ম। যুগে যুগে কালে কালে কত মানুষের উদ্ধারস্থল এই বিষ্ণুপাদপদ্ম। এখানে প্রতিদিন রাতে করা হয় বিষ্ণুপদ শৃঙ্গার। উল্লেখ্য বর্তমানে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন রানী অহল্যাবাঈ হোলকার।

যারা গয়াধামে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন তাদের জেনে রাখা ভাল, এখানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আপন স্বরূপ দর্শণ হয় বা অষ্টসাত্বিক লক্ষণ প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানেই তাঁর গুরুদেব শ্রীঈশ্বরপুরীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানেই তাঁর দীক্ষালাভ হয়। আবার এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পিতৃপিণ্ডদান করতে গেলে গদাধর স্বপ্নে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার কথা জানান। তাই সুযোগ হলে অবশ্যই গয়াতীর্থ পরিদর্শন এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার অনুরোধ রইল।

প্রবন্ধ

যুদ্ধের মাঝে যখন দুর্গা আসে

সুচন্দ্রা ঘটক

আছে যুদ্ধ, আছে মৃত্যু। তার মধ্যে কি ঠাঁই পায় উৎসব? ভাল দেখায় কি? শত শত মানুষ কষ্টে যখন, তখন আনন্দ-সাজ মানায় কি?

ফিরে দেখা যাক দুর্গাপুজোর উৎস। বাংলায় এই পুজো প্রধান উৎসবের আকার নিল ঠিক কবে থেকে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। ইতিহাস নানা সময়ের কথা বলে। তবে শোনা যায়, ১৬১০ সালে কলকাতায় প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী। তার পর থেকে ধীরে ধীরে বিত্তশালীদের মধ্যে এই পুজোর চল হয়। হুগলি, বর্ধমান, নদিয়ায় বিভিন্ন জমিদার বাড়িতে শুরু হয় পুজোর আয়োজন। তবে কলকাতায় দুর্গোৎসব বড় আকার নেয় শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের আমলে। ১৭৫৭ সালে হয় সেই পুজো। বিরাট জাঁকজমক করে শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজন হয় দেবী আরাধনার। নেমন্তন্ন করা হয় লর্ড ক্লাইভকেও। এ হল সেই সময়, যার ঠিক কয়েক মাস আগেই হয়েছে বড়সড় একটি যুদ্ধ। পলাশির রণক্ষেত্রে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বেই ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি হারিয়েছে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ দৌলাকে।

পুজোর মরসুম মানেই আনন্দের আবহ। মন ভাল রাখা। ভাল থাকা। অপরকে ভালবাসার কথা আসে। সারা বছর যে যা-ই করুন না কেন, এই সময়টায় স্বজন-পড়শির হাতে হাত রেখে উৎসবের আনন্দে মাতার কথাই হয় চারপাশে। কিন্তু কারও কারও মনে আবার প্রশ্নও আসে। চারপাশে যখন যুদ্ধ হয়, অতিমারির ধাক্কা সামলে চলতে হয়, তখনও কি শরতের গন্ধ একই রকম লাগে? এমন পরিস্থিতিতে আনন্দে মাতা উচিত কি না, সে কথা কারও কারও মনে আসতেই পারে।

যাঁদের মনে এই প্রশ্ন আসবে, তাঁদের জন্যই কথার শুরুতে শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর গল্প বলা হল। সে বার যুদ্ধ হয়েছিল খাস বাংলায়। পলাশির যুদ্ধের পরে পুজোয় নেমন্তন্ন পেয়েছিলেন শত্রু স্বয়ং।

দুর্গাপুজো মূলত বাংলার উৎসব। স্টকহোম থেকে অনেক দূরে কলকাতা শহর। সে মহাদেশে যুদ্ধ নিয়ে আপাতত সমস্যা নেই। ফলে মনে হতে পারে, কলকাতায় না হয় হতেই পারে পুজো। তাই বলে যে মহাদেশে রাশিয়া-ইউক্রেন নিয়ে এত কাণ্ড, সেখানে জাঁকজমক করে সর্বজনীন দুর্গোৎসব কি মানায়? এই প্রসঙ্গ উঠেছিলও কোনও এক আড্ডায়। ইতিমধ্যে শরৎকাল এসেছে। পুজো এসেছে। নতুন জামা পরার সময় এসেছে। তাই পলাশির যুদ্ধের সময়ের দুর্গাপুজোর গল্পও নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ইদানীং ‘টক্সিক পজ়িটিভিটি’ নিয়ে অনেক চর্চা হয়। যে কোনও উপায়ে ভাল থাকতেই হবে, মন ভাল আছে দেখাতেই হবে, সকলকে ভালবাসতেই হবে— এ সব ভাবনাকে প্রশ্ন করে মনোবিদ্যার একটি শাখা। বলে, মন ভাল না থাকার কারণ যদি ঘটে, তবে জোর করে হাসতে হবে না। যে কোনও উপায়ে আনন্দের আভাস দেওয়াও এক অর্থে বিষাক্ত। তা আসলে কষ্টকর। ফলে কঠিন সময়কে কঠিন বলে মেনে নেওয়াই যায়। অকারণ ইতিবাচক হওয়াকে বিষাক্ত বলে ধরেন সেই মনোবিদেরা।

তা তো বটেই। সুখে না থেকেও সুখে থাকার ভান করা তো অবশ্যই কষ্টের। কিন্তু তার সঙ্গে কি মেলানো যায় যুদ্ধের পরিস্থিতিকে? নাকি সেই ভাবনার ছকে ফেলে দেওয়া যায় উৎসবকে? টক্সিক পজিটিভিটির ফাঁদের প্রসঙ্গে কিন্তু দুর্গাপুজো আসে না।

বরং ভেবে দেখা যেতে পারে উৎসব বিষয়টি আসলে কী। উৎসব কি নিছক আনন্দ? মানে অকারণ আনন্দ কি? যদি তা-ই হয়, তবে না করলেও চলত। কারণ, কঠিন সময়ে অকারণ আনন্দযাপনকে বিষাক্ত বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু তা তো নয়। উৎসব হল এমন একটি আয়োজন, যা মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে।

সারা বছর একে অপরের থেকে দূরে যাওয়ার কারণের অভাব ঘটে না। পাশাপাশি থাকতে গেলে ঠোকাঠুকি লাগে। তার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অসুখ-বিসুখ, অভাব-অনটন তো রয়েছেই। ফলে দূরত্ব এবং দুঃখের কারণের অন্ত নেই। শুধু দূরত্ব নিয়ে বাঁচা যায় না। বেঁচে থাকতে মানুষের মানুষকে লাগে। ঠিক যেমন ছোটবেলায় পড়া হয়েছিল, মানুষ হল সামাজিক প্রাণী। সেই সামাজিক প্রাণীকে সমাজই বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই তো একে অপরকে কাছে নিয়ে আসার কারণের সূত্র খুঁজে বার করেছে মানুষই। দুর্গাপুজো তেমনই একটি উৎসব। একা একা হয় না। অনেকে মিলে করতে হয়। আয়োজনই এমন বিপুল। আর সেই আয়োজন থেকেই সামাজিকতা শুরু। যুদ্ধ, অতিমারি যখন দূরত্ব বাড়ায়, যে কোনও সামাজিক আয়োজন তখন তা ঘোচাতে সাহায্য করে।

দুর্গাপুজো নিয়ে কথা হচ্ছে ঠিকই। তবে ধর্মের কথা না হয় এই আলোচনা থেকে বাদ রাখা গেল। ধর্মের ধারণা এক এক জনের কাছে এক এক রকম। কিন্তু উৎসব তো পাঁচ জনে মিলে হয়। দুর্গাপুজো বরাবরই ব্যক্তিগত ধর্মবোধের ঊর্ধ্বে গিয়ে সামাজিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সেখানেই আরও অনেক আয়োজনের থেকে আলাদা হয়ে থেকেছে দুর্গাপুজো। যে কোনও কঠিন সময়ে এমন উদ্যোগ অনেককে কাছে টেনে আরাম দিতে পারে। আর অসময়ে আরামের খোঁজ করাই তো স্বাভাবিক।

শরতকালের এই পুজো হল শক্তিরূপী দেবীর আরাধনা করে অশুভকে দমন করার উদ্‌যাপন। বলা যায় এ হল, সারা বছরের মন্দকে পিছনে ফেলে আনন্দকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। মন্দের মাঝে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার অভ্যাস এবং অনুশীলন কিন্তু ইতিহাসের সব সন্ধিক্ষণে, বিভিন্ন সমাজেই হয়ে এসেছে। যেমনটা হয়েছে পলাশি-পরবর্তী বাংলায়।

চলে যাওয়া যাক ইউরোপেরই এক গল্পে। বোকাচিয়োর ‘দ্য ডেক্যামেরন’-এর কথা ধরি। দশ রাতের দশ জনের দশ রকম গল্প। কিন্তু গল্পগুলির নেপথ্যে রয়েছে ইটালির ভয়াবহ প্লেগ পরিস্থিতি। মধ্যযুগের কথা। ফ্লোরেন্সে তখন কঠিন অবস্থা। অধিকাংশেই স্বজনহারা। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে কোনও মতে পালিয়েছেন দশ জন। তার মধ্যেই ভাল থাকার চেষ্টা। সন্ধ্যাটা একটু ভাল ভাবে কাটানোর ভাবনা। প্রতি সন্ধ্যায় দশ জন দশটি করে গল্প বলেন। আর সেই একশোটি গল্প এত বছর ধরে তুলে ধরছে বাঁচার মরিয়া আকাঙ্ক্ষাকে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই। ভাল থাকার চেষ্টা তো দোষের হতে পারে না। যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও নয়। বরং এমন অবস্থায় আনন্দের বার্তা দিতে পারার জন্য মনের জোর লাগে। কারও কারও আছে সে ক্ষমতা। আর যাঁর নেই, তাঁকে বাকিরা জোগাবেন এক হয়ে। সে জন্যই তো সমাজ নিয়ে বাঁচার চেষ্টা। গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোর দুই মূল কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ, এই সময়টিতে অসুখে জর্জরিত থাকছে। ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। তাতেও পুজো বাদ পরেনি। করোনার সময়ে আকারে ছোট হয়েছে হয়তো শুধু। তবু উৎসব বন্ধ হয়নি।

পুজোর লেখা সাধারণত আনন্দের হয়। গল্প। কাব্য। ভ্রমণ। এ সবই বেশি আসে। কিন্তু চারধারের এত হাহাকারের মাঝে কোথাও প্রশ্নও তোলা জরুরি। সে প্রশ্ন যদি মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়, তবে উত্তর খুঁজতে হয়। উত্তর বলে, সমাজ ছাড়া মানুষ ভাল থাকে না। আবার মানুষ ছাড়া সমাজ বাঁচে না। উৎসব সকলকে কাছাকাছি এনে সমাজকে উজ্জীবিত রাখে। ফলে যুদ্ধ যখন ধ্বংস করে, তখন সেই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে পারে উৎসবই। এমন সময়ে উৎসব পালন করা তাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার এক মরিয়া চেষ্টাও বটে।

Anwesha

কবিতা

লড়াই

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

' ব্যাদে সবই আছে' শুনে
পণ্ডিতেরা হাসে।
ইতিহাসের খোলা পাতা
পড়ে পায়ের পাশে।
রাজনীতির সব দাদা দিদির
কিসে মাথা ভারী?
ইতিহাসের সাথে তাদের
চিরকালের আড়ি।
কোন পথেতে শাসক বদল,
স্বৈরাচারী ছলে।
ইতিহাসের বুকের রক্ত,
সেসব কথাই বলে।
কোথায় নজর সেসব পাঠে,
বইগোঁজা সব মাথা।
আগাম ভাবার বুদ্ধি কোথায়?
চুলোয় অতীত কথা।

রাজনীতিতে আর একটি দল,
চিরদিনই আছে।
' অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ'
গদীটি থাক কাছে।
গদী কারো নয়কো বাপের
রাখবে হাঁড়ি ভরে।
গোকুলেতে বাড়ছে যারা,
নেবে উজার করে।
ছেড়ে দিয়ে ধরবে বলে
যতই দৌড়ে মর।
ভুলের মাসুল দিতেই হবে
চেষ্টা শত কর।
ধৈর্য ধর ধরবে ফাটল
ঐ দুর্গের গায়।
তখন আবার ভুল কোরোনা
লড়াইয়ের কায়দায়।

ভ্রমণ

আফ্রিকার জঙ্গলে রাজার মুখোমুখি

সুপর্ণা সান্যাল

হঠাৎ গা ঝেড়ে একগোছা শুকনো ঘাসফুল উড়িয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর চোখে চোখ রেখে চূড়ান্ত সাবলীল রাজকীয় ভঙ্গিমায় এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের জীপটার দিকে। সকালের সোনালী রোদে তার উড়ন্ত কেশর দৈব প্রভাময়, তার নীলচে সবুজ চোখে অনাহুত অনুপ্রবেশকারীদের অনায়াস শাসন, তার বন্ধ ঠোঁটের নিখুঁত ভঙ্গিমায় ব্যাক্তিত্ব ও তাচ্ছিল্য! আমাদের জীপের ইঞ্জিন বন্ধ, আমরা যেন শ্বাস নিতেও ভুলে গেছি, শুধু হার্টবিট এত দ্রুত যে যেন ধকধক আওয়াজ শুনতে পারছি। সামনে তাকিয়ে দেখি আমাদের জীপের দরজা সটান খোলা আর সেই পাটাতনের ওপর জীপ থেকে প্রায় আদ্ধেক শরীর বার করে আফ্রিকার রাজার দিকে সোজা ক্যামেরা তাক করে লেন্সে চোখ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে রুকু। একটুও নড়ছে না। এদিকে পশুরাজ সোজা হেঁটে আসছে এদিকেই। মুহূর্তের মধ্যে আমার কপালে ঘাম জমতে শুরু করল। একেবারে আটপৌরে বাঙালি মায়ের মতো প্রাণটা ভয়ে কেঁপে উঠল। আর মাত্র ক'হাত তফাত দুজনের মধ্যে। দুজনেই অপলক দুজনের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ কি মনে হোল, পশুরাজ থেমে গেল। একটু এদিক ওদিক দেখে পিছনের দুপায়ের ওপর বসে বিশাল মুখব্যাদন করে হাই তুলল। তখন বিপ্লব আর রুকুর ক্যামেরায় শুধু continuous shot-এর শব্দ। এই মুহূর্তটার জন্যেই ওরা রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় ছিল। হাই তোলা শেষ হলে পশুরাজ বসে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে সামনের থাবার ওপর মাথা রেখে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। নিশিন্ত ঘুম।

ততক্ষণে রুকু ক্যামেরা নিয়ে উঠে বসেছে। ওর মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি। আসলে কেউ যদি জঙ্গল পাগল হয়, আর ছবি তোলার মনোমতো বিষয়বস্তু আর একটা সঠিক মুহূর্ত পায়, তাহলে তার জন্যে যা খুশী বাজী ধরতে পারে। ওই দুহাত দুরত্ব থেকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ সিংহের হাই তোলার ছবি লেন্সবন্দী করার সুযোগ আর হাতে চাঁদ পাওয়া – দুটোই ওদের কাছে সমার্থক! এইসব মুহূর্তকে সরাসরি উপলব্ধি করার জন্যেই তো এত কাঠখড় পুড়িয়ে কেনিয়ার জঙ্গলে আসা।

আফ্রিকার রাজা সিংহ। আর কেনিয়ার সব জঙ্গলের রাজা হোল মাসাইমারা। আমরা যারা বুদ্ধদেব গুহর রুআহা আর আফ্রিকার অন্যসব গল্প পড়ে বড় হয়েছি তারা প্রত্যেকেই মনে মনে স্বপ্ন দেখি একবার না একবার মাসাইদের দেশে যাব। মাসাইরা যোদ্ধার জাত। তারা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাছুরের গলায় ফুটো করে গরম রক্ত খায়! তাদের বিয়ের সময় সিংহ শিকার করে পুরুষত্বের প্রমাণ দিতে হয় (আগে হত! এখন আইনত নিষিদ্ধ)। তাই এবারে কেনিয়া সাফারিতে যখন এক খোদ মাসাইকে গাইড কাম ড্রাইভার পেলাম তখন মনে হল সোনায় সোহাগা। সেই মাসাই গাইডের নাম জ্যাকসন। সে নিজে বলে রক অ্যান্ড রোল জ্যাকসন। মাসাইমারার সাভানায় থাকা-না-থাকার সমান রাস্তা দিয়ে সে যখন দুদ্দাড়িয়ে গাড়ী ছোটায় তখন বোঝা যায় ওই নামের মাহাত্ম্য। জ্যাকসন কিন্তু পরে থাকে মাসাইদের পোশাক সুকা, আর কোমরে গোঁজা বিরাট লম্বা ছুরি। গতবছর থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন জঙ্গলে

নানান গাইডের সঙ্গে ঘুরে বুঝতে পেরেছি যে এইসব সাফারিতে গাইডের ভুমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ! গাইড হবে এমন যে জঙ্গল হবে তার নখদর্পণে আর চোখ হবে ঈগলের মতো। তাকে এমন তুখোড় ড্রাইভার হতে হবে যে যেকোনো পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে গাড়ী নিয়ে পৌঁছে দেবে অন্য সব গাড়ীর আগে। শুধু তাই নয়, জন্তু জানোয়ারদের গতিবিধি নিয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। হয়ত একটা চিতা ঘাসজমিতে শরীর ডুবিয়ে হাঁটছে। আর অনেক গাড়ী কোনোরকম নিয়ম ও এথিক্সের পরোয়া না করেই তার পেছনে ধাওয়া করেছে। পোক্ত গাইড হোলে সে কিন্তু আন্দাজ করতে পারবে যে জন্তুটা কোথা দিয়ে যাবে। পুরো উলটো পথে গাড়ী ছুটিয়ে এমন জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাবে যে চিতাটা ঠিক সেখান দিয়েই যাবে।

মাসাইদের একটা মজার গল্প বলি। একদিন সেকেনেনি গেটের কাছে একটা মাসাই গ্রাম দেখতে গেছি। সেখানে পৌঁছতেই তো তারা মেয়েদের নাচগান আর ছেলেদের দলবদ্ধ হাই-জাম্প দেখিয়ে ওয়েলকাম করল। মাসাই সর্দারের ছেলে তাদের বসতি ঘুরিয়ে দেখাল। মজার কথা যে এদের অনেকেই, বিশেষত যারা ট্যুরিজ্‌ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, তারা ঝরঝরে ইংরেজি বলে। গোটা বসতি গোবর লেপা, মেঝে, দেওয়াল সব। সেই গন্ধ নাকে সয়ে গেলে অবাক হয়ে দেখলাম যে বংশপরম্পরায় কি কায়দায় কাঠে কাঠ ঘসে তারা শুকনো ঘাসে আগুন জ্বালায়। বাছুরের গলা থেকে রক্ত খাওয়াও দেখাতে চাইছিল, আমরাই পিছিয়ে এলাম। যখন বেরিয়ে আসছি দুটো অল্পবয়েসি মাসাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়লজাবে। ওরা বলল যে দুজনেই নাইরোবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, ইকোনোমিক্স পড়ে। রুকুও ইকোনোমিক্সে মাস্টার্স করছে শুনে ওরা জিজ্ঞেস করল যে ও কি বই পড়ে। দেখা গেল যে দেশ, কাল, পরিস্থিতি সব আলাদা হওয়া সত্ত্বেও রুকু আর ওরা একই লেখকের একই বই পড়েছে। ঘটনাটা হয়ত খুবই সাধারণ, কিন্তু নিজে ইউনিভার্সিটির মাস্টারনী হওয়ার সুবাদে সেই অরণ্য অধ্যুষিত মাসাই গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে মনটা খুশি-খুশি হয়ে গেল। দেশ, অর্থ ও জাতীর গন্ডির ঊর্ধ্বে বই তাহলে এখনো সংযোগমাধ্যম! কি যে ভালো লাগলো!

নাইরোবি থেকে ২০০ কিমি দক্ষিণে আম্বোশেলী ন্যাশানাল পার্ক। দুটি কারণে এখানে আসা। প্রথমটা হোল বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়। যেখানে শঙ্করের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী দুধেভাতে বাঙ্গালিকে প্রথম আফ্রিকার জঙ্গলের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোই প্রকৃত চাঁদের পাহাড় কিনা এই নিয়ে দ্বিমত থাকলেও আমি একরকম ঠিকই করেছিলাম যে কিলিমাঞ্জারো আমাকে দেখতেই হবে। আম্বোশেলী যেদিন এলাম মেঘের আস্তরে কিলিমাঞ্জারো প্রায় ঢাকা। মনটা একটু দমে গেল। কিন্তু পরের দিন সূর্যদয়ের আগে ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাঁবু থেকে যেই বাইরে পা রেখেছি সামনে তাকিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। ভোরের আবছা নীলচে আলোয় সে সুবিশাল পাহাড় চোখের সামনে দৃশ্যমান। একেবারে আঁকা ছবির মতো মসৃণ দুপাশ, বরফ ঢাকা প্রায় সমতল মাথা। তার সামনে হ্রদ। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে কিলিমাঞ্জারোর ছায়া। হ্রদ ভরে আছে গোলাপি ফ্লেমিঙ্গোতে। সবাই মাথা নিচু করে শ্যাওলা খেতে ব্যস্ত। তাদের গোলাপি ছায়া আর সদ্যজাগ্রত সূর্যের গোলাপি আলোয় সব অপার্থিব সুন্দর।

ঘোর কাটলো গাইড পিটারের ডাকে। সে নিয়ে যেতে চায় জঙ্গলের গভীরে, যেখানে আম্বোশেলীর বিখ্যাত হাতির পাল সপরিবারে জলকেলি করতে আসে। হ্যাঁ, হাতিই আম্বোশেলীর দ্বিতীয় আকর্ষণ। বেশীদুর যেতে হোল না। একটা জলা জায়গা পেরিয়ে একটু উঁচু জমিতে চড়ছি, কাছেই দেখি অন্তত পঞ্চাশটা হাতির একটা দল। বড়, ছোট, মাঝারী, কেউ জল খাচ্ছে, কেউ

শুঁড়ে করে মাটি মাথায় ছুঁড়ে mud bath নিচ্ছে। কেউ নির্বিকার ভাবে গাছ ভেঙে খাচ্ছে। আমাদের জীপটা দেখে তারা একটু সজাগ হলো। বড় বড় চার পাঁচটা হাতি সদ্যজাত দুটো গাব্দু-গুব্দু বাচ্চাকে মাঝখানে রখে ব্যারিকেড করে দাঁড়ালো। বেশ কিছুক্ষন কাটার পর যখন ওরা নিশিন্ত হোল যে আমাদের থেকে ওদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই, তখন সার বেঁধে এগিয়ে আস্তে লাগলো। সবচেয়ে আগে আসলো এক বিশাল

দাঁতাল মেট্রিয়াক। তার কানদুটো একেবারে ছড়ানো, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মানে আমাদের শাসানোর ভঙ্গি। আমাদের গাড়ীর থেকে মাত্র ক-মিটার দূরে দাঁড়িয়ে সে দাপটের সঙ্গে বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গতে লাগল। আমরা একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ কিছুক্ষন বাদে শেষ হোল প্রতিক্ষার। আমাদের গাড়ীর ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকের জঙ্গলে গিয়ে সে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর তাকে ফলো করে একে একে আমাদের সামনে ও পিছনে দিয়ে বড়, মেজো, ছোটো সব্বাই রাস্তা পেরিয়ে চলল। বাচ্চা হাতিরা দুটো বড় হাতির মাঝখানে। একটা উঠতি বয়েসি হাতি কৌতূহল না সামলাতে পেরে আমাদের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে পরখ করতে যাচ্ছিল। আমরা আস্তে আস্তে সীটে বসে পড়লেও সে হাল ছাড়লো না। এগিয়ে এসে জীপের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখা জারী রাখলো। তখন আমাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। যাওয়ারও কোন জায়গা নেই। একে একে সব্বাই ওপারে চলে যেতে তবে আমরা এগোনোর রাস্তা পেলাম। পিটার গাড়ী ছোটাল ক্যাম্পের দিকে। তবে ক্যামেরাওলাদের মুখে চওড়া হাসি।

গতবারের সাফারির ক্লাইম্যাক্স ছিল মাসাইমারাতে কাছ থেকে দেখা একটা বিরাট লেপার্ড, একটা ইম্পালা মেরে তাকে গাছের ওপর টেনে তুলে খাচ্ছে। একেবারে রেয়ার সাইট। আর এবারের ট্রিপেরও ক্লাইম্যাক্স হোল মাসাইমারাতেই। সেদিন কাকভোরে আমরা বেরিয়েছি গেম ড্রাইভে। কিছুদূরে গিয়ে দেখি আকাশে চিলের দল গোল হয়ে ঘুরছে। মানে কোথাও শিকার হয়েছে। তাদের লক্ষ করে এগোতেই সামনে একেবারে ডকুমেন্টারী ফিল্মের মতো দৃশ্য। একটা বিশাল জলহস্তিকে শিকার করে অন্তত দশটা সিংহ আর সিংহী তাকে ঘিরে ধরে খাচ্ছে। আরো কিছু সিংহ আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সঙ্গে দুটো বেড়ালের সাইজের বাচ্ছা! এরা হোল মাসাইমারার সবচেয়ে বিখ্যাত সিংহের দল মার্শ প্রাইড। বিবিসি আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফীক খ্যাত। প্রথম সূর্যের আলো যেই মাটি ছুঁলো, ওমনি সিংহগুলোর রক্তমাখা মুখ দাঁত আরও ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগলো। অতবড় হিপোটার পেট দুফাঁক। পাঁজরার হাড়গুলো আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী। একটু পর্যবেক্ষণ করেই বুঝতে পারলাম যে শিকারের ভাগ নিয়ে ওদের মধ্যে পরিস্কার হায়ারার্কি রয়েছে। কেউ কেউ তো একেবারেই অপাংক্তেয়। বিদলীয় সিংহের সঙ্গে প্রছন্ড গর্জনসহ একচোট সংঘর্ষও হয়ে গেল। কখন যে ঘন্টা ফিরে গেছে খেয়াল নেই। পিছনে চেয়ে দেখি চারপাশ থেকে হায়নারা জড় হচ্ছে। আকাশেও শকুনদের জটলা ক্রমশ বাড়ছে। সিংহদলের খাওয়া শেষ হতে না হতে জেট প্লেনের মতো ডাইভ মেরে বিশাল বিশাল ডানা ঝাপটে জমিতেনেমে এলো শকুনরা। তারপর হাড়ের গায়ে লেগে থাকা মাংস ধারালো ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ঠুকরে খেতে লাগলো। নিমেশের মধ্যে বিশাল জলহস্তির মাথার খুলি আর চামড়াহীন দাঁতগুলো প্রকট হয়ে দাঁড়ালো। ততক্ষনে জ্যাকল আর হায়নারা চলে এসেছে খুব কাছে। তারাও শকুনগুলোর পাশাপাশি খাবারের সন্ধানে হিপোটার অংশাবশেসের ওপর হামলে পড়ল। হায়নাদের চোয়ালে ভীষণ জোর। আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাজ্য করে তারা দলবদ্ধ হয়ে মট মট করে হাড় চিবিয়ে খেতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ কেশর উড়িয়ে টিপির ওপর থেকে ধাওয়া করে

এলো মার্শ প্রাইডের দলপতি। তাকে দেখেই হায়নারা খাওয়া ছেড়ে পালালো। শকুনরাও বিশাল ডানা ঝটপটিয়ে উড়তে লাগলো। কিন্তু সিংহরাজ সরে যেতেই আবার সবাই পায়ে পায়ে ফিরে এলো। এরকম কবার হবার পর সিংহমশাই খান্ত দিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই অতবড় প্রাণীটার কাঁধের আর পেলভিক গার্ডলের হাড়টুকু ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না। ভয়ঙ্কর কিন্তু অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

মাসাইমারায় আমাদের সাফারির শেষ দিন। জঙ্গলকে গুডবাই বলে ক্যাম্পে ফিরে আসছি, এমন সময় জঙ্গলের সীমানায় সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। মাসাইমারার endless plane পেরিয়ে দিগন্ত রাঙা কমলা লালে। মাঝখানে আগুন রঙা আভা। তার ওপরে স্তরে স্তরে লাল, গোলাপি ও বেগুনী রঙের রঙ্গোলী নীলে গিয়ে মিশেছে। আর সেই আলোর কেন্দ্রে বিচরণ করছে ইমাপালা আর টোপীরা।এ বড় মায়াবী সময়, ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চিরস্থায়ী অন্তরে। অনেক কথাই বলা হোলনা। আম্বোশেলীর সেই চিতা মা, যে তার তিন সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য বার বার শিকারের চেষ্টা করছিল। কিমবা মাসাইমারার সেই সিংহগুলো যারা রোদ এড়াতে আমাদের গাড়ীর ছায়ায় পাঁচ-ছ ঘন্টা ঘুমোচ্ছিল। অথবা ওল পেজেতার গন্ডারযুগল, যারা না জেনেই বিষুবরেখার দুপাশে মানে একজন উত্তর ও অন্যজন দক্ষিণ গোলার্ধে বসে একে ওপরকে দেখছিল। কিন্তু প্রকৃতির যে রংবাহার আফ্রিকান সাফারিতে গিয়ে দুচোখ ভরে দেখেছে জন্মজন্মাতরেও ভুলিব না।

কবিতা

থাকবে মনে

আরণ্যক বসু

কবি, তোমার পরের জন্মে
এই মাটিতেই জন্ম নিও
আকাশছোঁয়া ধানের ক্ষেতে
সমস্ত রঙ ছড়িয়ে দিও।

আমি যখন পঞ্চদশী
তুমি তখন ষোলই বোধ হয়
আমি যখন বন্যকুসুম
তুমি তখন কবিতাময়।

ছাদের উপর মাদুর পাতা
আমার গলায় কান্ত কবি
দূরে কোথাও ট্রেনে যাচ্ছে
প্রহরজোড়া শান্ত ছবি ।

আমি তখন বর্ষা ব্যাকুল
মেঘলা বাতাস, রাই কিশোরী
তোমার যখন উড়ন্ত চুল
আমার ফ্রকে সলমা জরি।

চিলেকোঠায় কেউ থাকেনা
পায়রাগুলোর ক্লান্ত প্রলাপ
দুটো ঠোঁটের প্রথম ছোঁয়া
আমি তখন ব্যগ্র গোলাপ।

ভয়ে ,লজ্জায় , বুক দুর দুর
সেই শুরু , সেই অশান্তিময়,
তুমি তখন কলেজ, ক্রিকেট
আমি তখন স্তব্ধ সময়।

সন্ন্যাসিনীর একি জ্বালা
পঞ্চশরের বর্ণচ্ছটায়
অন্তবিহীন হলুদ কুসুম
যা ইচ্ছে তাই গুজব রটায়!

রটাক গুজব নিন্দে করুক
দাঁড়িয়ে থাকি বিরল ভোরে
স্টেশন রোডের লাজুক হাওয়ায়
কখন তোমার রুমাল ওড়ে।

হওয়ার কথা ব্যাকুল বাতাস
হওয়ার কথা ব্রজের ধূলি
মাধুকরীর জন্যে য়াওয়া
সাজবিহানের শূন্য ঝুলি।

পরের জন্মে প্রথম দেখায়
লুটে নিও, ভাসিও দু-কুল
তোমায় দেখব পাগল বাউল
ভাঙ্গা পথের ছিন্ন মুকুল।

আবার যদি ইচ্ছে কর
রাঙিয়ে দিও আমার আঁচল

সময় হবে মেঘ ঘনাবার
সময় হবে বৃষ্টি নামার।

সময় রেখো হারিয়ে যাওয়ার
সময় রেখো দূরের বাসে
সময় রেখো গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড
একটি সিটে তোমার পাশে।

এ জন্মে যা বলা গেলো না
ও জন্মে তা ঠিক্ শুনবোই
কনে দেখা আলোয় ছাদে
কান পেতে রই , প্রাণ পেতে রই!

এ জন্মে তো ফুটলো শিমূল
লাগলো আগুন বনে বনে
ফুলের পোশাক পরিও আমায়
পরের জন্মে , থাকবে মনে!

কবিতা

দিনলিপি

সমরেন্দ্র কুমার দত্ত

নীল আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে
সূর্য উঠে গেল ,
সুন্দর একটা নতুন দিন
সবাই কাছে পেল ।
ব্যস্ত হলো সবাই যে যার
নিজের নিজের কাজে ,
সময় যাবে আপনি চলে
আনন্দেরই মাঝে ।
নানান লোকে নানান কাজ
করবে আপন তালে ,
রাত্রিতে ফুটবে হাসি
দিনটা ভাল গেলে ।
আপন চলার ছন্দে যেমন
নতুন দিন আসবে ,
শেষে আবার রাত্রি এসে
অন্ধকার নামবে ।
দিন আসে রাত যায়
আপন চলার তালে,
মনের স্মৃতিতে তারা
নানান ছাপ ফেলে ।

প্রবন্ধ

চারুকেশী

ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক

১৯৯২ সাল | জানুয়ারি মাস | এই সময় কলকাতা নানা রঙে - রসে মেতে ওঠে | নলেন গুড় | বইমেলা |আরও নানা প্রাঙ্গণে নানা রকম উৎসব | রসিক জনের জন্য শাস্ত্রীয় সংগীতের সম্মেলনের মরসুম | ডোভার লেন | গোলপার্ক | কখনো বা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে | শহরতলিতে উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্রের পোস্টারে দেখলাম বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলী | ওস্তাদ জাকির হোসেন | বেগম পারভীন সুলতানা |পণ্ডিত যশরাজ | এঁদের কারো অনুষ্ঠান সামনাসামনি দেখিনি কখনো | তখন সিডির চল হয়নি তেমন | ক্যাসেটে শুনতাম এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের সঙ্গীত | ক্যাসেটের স্বল্প পরিসর এঁদের সঙ্গীত ধরতে পারতো না তেমন | সংক্ষিপ্ত আলাপে মন ভরতো না | মনে হতো কবে কোন জলসায় সামনাসামনি এঁদের সঙ্গীত শুনতে পাবো |

আমার বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজন উত্তরপাড়ায় থাকেন | তার ভেতর বেশ হোমড়া-চোমড়া ভাতৃস্থানীয় একজনকে বললাম -- 'ভাই, এই সম্মেলনের একটি ভালো টিকিট জোগাড় করে দিতে পারবে ? সে বললো -- হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো ব্যাপার না | তোমার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবো আমি টিকিট ' | সম্মেলনের সময় এগিয়ে আসছে | টিকিটের কোন খবর নেই | ফোন করলে ফোন ধরে না সেই ভরসা-দেওয়া ভাই |একদিন হঠাৎ করে পেয়ে যাই তাকে ফোনে | শুকনো গলায় বলে -- 'দাদা, হলো না | সব টিকিট বিক্কিরি হয়ে গেচে | কিছুতেই পারলাম না এবার |' মনটা খারাপ হয়ে গেল | কলকাতা থেকে উত্তরপাড়া এসে টিকিট কাটা বেশ অসুবিধা হলেও, মনে হলো নিজে চেষ্টা করলেই হতো | মনের কষ্ট গিলে ভাবলাম পরেরবার না হয় নিজেই চেষ্টা করবো |

আমার বন্ধু সোমনাথ দাশ ব্যান্ডেলে থাকতো | ওর বাড়ি গিয়েছি এক উইকেন্ডে | রাতটা থেকে পরের দিন দুপুরে ফিরবো | সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি বেশ জমিয়ে গল্প করছি | মাসিমা মাঝে মাঝেই ধোঁয়া ওঠা চা আর নানা রকম গরম গরম তেলেভাজা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওপরে | লোডশেডিং হয়ে গেল এমন সময় |শীতের রাতে কাজ নেই তেমন কিছু আড্ডা মারা ছাড়া | এমন রাতে লোডশেডিংকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেশ থাকা যায় | চা-চপ-মুড়ি আর রাজা-উজির মারা গল্প করে | এমন সময় বাড়ি ঢুকলেন সোমনাথদের পারিবারিক বন্ধু শিবাজিদা | জমাটি, আমুদে মানুষ | সেদিন দেখলাম মুখটা একটু বেজার | জিজ্ঞেস করলাম -- 'লোডশেডিংয়ে মুড অফ নাকি গো ? চা খেয়ে জমিয়ে একটা সিগারেট ধরাও | ভালো লাগবে | শিবাজিদা আনমনে চায়ের কাপে একটা দায়সারা চুমুক দিয়ে বললো -- 'কি বিপদে পড়েছি দেখতো | একজন একটা টিকিট দিয়েছে উত্তরপাড়ায় কি একটা ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রাম হচ্ছে হোল নাইট, তার | আমি ওসব বুঝিটুঝি না | কি করি বলো তো ?' সোমনাথ আর আমি দুজনেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের খুব ভক্ত | বললাম -- 'কি টিকিট দেখি তো ?' শিবাজিদা চাদরের ভেতর থেকে একটা খাম বের করলো | খুলে দেখি উত্তরপাড়া সঙ্গীত সম্মেলনের একটি ভিআইপি টিকিট | বললো -

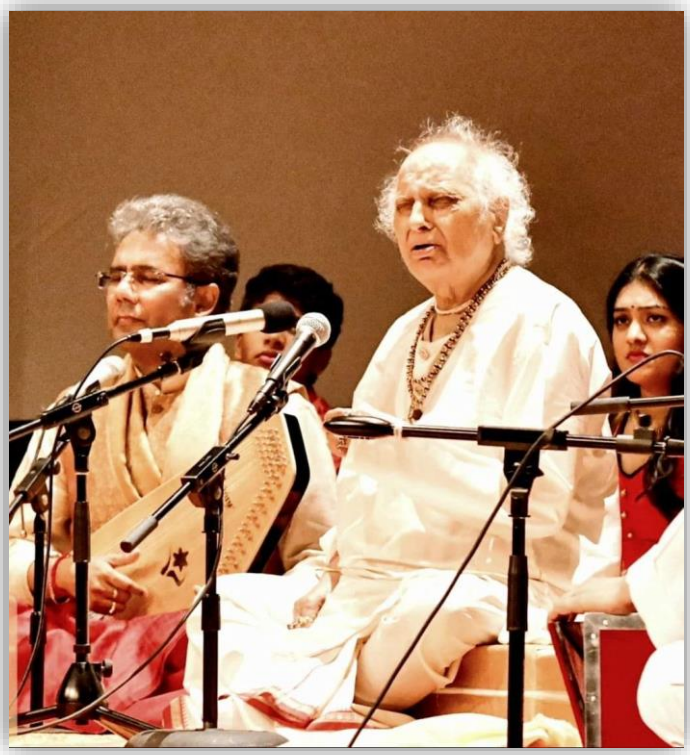

- 'তোমরা কেউ যাবে নাকি ?' সোমনাথ আমাকে বললো -- 'তোর খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল এই প্রোগ্রামে | দেখ, টিকিট পেয়ে গেলি' | ওকে বললাম -- 'তুই যাবি না ?' ও বললো -- না রে, এটাতে তুইই যা | তুই আবার কবে বিলেত তিলেট চলে যাবি | আমি তো আছিই | বন্ধুত্বের সঙ্গে কখনো কখনো শ্রদ্ধা মিশে যায় অনেকটা | সেই রাতটিও ছিল তেমনই একটি সময় |

****

সন্ধ্যার পর পৌঁছে গেলাম সঙ্গীত সম্মেলনে | উত্তরপাড়া সংগীত চক্র আয়োজিত এই

সম্মেলনটি হয় জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে | ভিআইপি গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমার টিকিট একদম সেকেন্ডে রোয়ে | মঞ্চের একদম কাছে | কয়েকদিন আগেও এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবো না বলে আপসোস করছিলাম | এতো ভালো সিট পেয়ে বেশ লাগছিল | ডোনা রায়ের (এখন গাঙ্গুলী) ওড়িশি নৃত্য পরিবেশনা আসরের সুর বেঁধে দিল এক দারুণ ছন্দে | মনিলাল নাগের সেতার বাদন ছিল তার পরে | বিষ্ণুপুর ঘরানার এই ব্যতিক্রমী শিল্পীর মন কাড়া বাজনা আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ করল সেই সুরেলা সন্ধ্যায় |

প্রায় দশটা পেরিয়ে বেশ খানিকটা বিরতি | শ্রোতারা লম্বা রাতের প্রস্তুতির জন্য যাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারেন | আমাকে মা একটি বাক্সে টোস্টেড স্যান্ডউইচ করে দিয়েছিলেন গোটা চারেক | সঙ্গে ফ্লাস্কে চা | ভারি ভাল লাগতো মায়ের হাতের ওই টোস্টেড স্যান্ডউইচ | আমার সিটে বসেই খাবার খাচ্ছিলাম | সামনের শ্রোতারা বাইরে গিয়েছিলেন | মঞ্চে যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করছিলেন কুশীলবেরা | হঠাৎ মঞ্চে প্রবেশ করলেন ওস্তাদ জাকির হোসেন | ওঁর নজরকাড়া ব্যক্তিত্বে মঞ্চ আলো হয়ে উঠল যেন | নিজের হাতে তবলা নিয়ে এলেন | তবলা বাঁধতে বাঁধতে এদিক-ওদিক দেখছিলেন | হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল | একেবারে সামনে বসেছিলাম | মনের আনন্দে স্যান্ডউইচ খাচ্ছিলাম |ওস্তাদজি হেসে বললেন -- ' মাম্মি নে খানা বানায়া হোগা | বহুত এনজয় কর রাহে হো ' | আমাকে উদ্দেশ্য করে ওস্তাদজি কথা বলছেন, আমি কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম | কোনরকমে বললাম -- ' জি হাঁ ওস্তাদজি' |

জাকির সাহেবের একক তবলার অনুষ্ঠান এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা রেলা, পারান, টুকরা, তেহাই, লগ্গি -- তবলার নানা বিচিত্র শব্দ, তাদের পেছনের গল্প দিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশনা করেন | তারপরে মন দুলিয়ে দেওয়া লহরা | তালে- লয়ে-ছন্দে কখন যে মাঝরাত পেরিয়ে যায় কারো খেয়াল নেই |

মনে হয় রাত দুটোর কাছাকাছি মঞ্চে প্রবেশ করেন বেগম পারভীন সুলতানা | রাগ দুর্গা দিয়ে শুরু করেন অনুষ্ঠান | ক্যাসেটে অনিবদ্ধ আলাপ শোনা যায় না বললেই চলে | হয়তো সীমিত সময়ের জন্য | সময়ের চাপ তেমনভাবে থাকে না এধরণের অনুষ্ঠানে | বেগম সাহেবার অনবদ্য আলাপে ভেসে যাচ্ছিলাম | যেমন করে ভেসে যাওয়া যায় হালকা স্রোতে | তাড়া নেই কোন গন্তব্যে পৌঁছোনোর - শুধুই ভেসে যাওয়া |

বেগম সাহেবা তিন সপ্তক জুড়ে তানের জন্য প্রসিদ্ধ। বিস্তারে আসতেই দর্শক নড়েচড়ে বসলেন ওঁর সেই বিখ্যাত তানে। খেয়াল শেষ হলো মনে হয় চারটের কাছাকাছি। শিল্পী একটু বিশ্রাম নিতে নিতে হয়তো ভাবছিলেন কি গাইবেন এর পর। দীর্ঘ খেয়াল এর পর হালকা কিছু গাওয়ার রীতি --ঠুমরি, ভজন, দাদরা। শ্রোতারা ওঁর বিখ্যাত ভজন 'ভবানী দয়ানী' গাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বেগম সাহেবা বললেন - 'সবে চারটে বাজে। এরপর পণ্ডিত যশরাজজি আসবেন। এখনই ভৈরবী গাইলে অসুবিধা হতে পারে'। কিন্তু শ্রোতাদের আগ্রহে 'ভবানী দয়ানী' ওঁকে গাইতেই হলো। সাড়ে চারটে নাগাদ যখন উনি অনুষ্ঠান শেষ করলেন, মনে হলো উত্তরপাড়ার ওই জায়গাটুকু ভোর হয়ে গিয়েছে। যদিও শীতের আকাশে তখনো চাপ চাপ অন্ধকার।

খানিক বিরতির পর পণ্ডিত যশরাজজি যখন মঞ্চে উঠলেন তখন পাঁচটা বেজেছে। সারারাত বহু মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সামিয়ানার ভেতর একটা ভারি গুমোট ভাব। পণ্ডিতজি উদ্যোক্তাদের বললেন --'একটু পর্দাগুলো তুলে দিন। আর বাইরের কিছু স্পিকার দিয়ে দিন। কেউ যদি বাইরে বসে শুনতে চান, শুনতে পারেন যাতে। ভৈরবীর পর কিছু গাওয়া একটু মুশকিল। আমি আজ চারুকেশী গাইবো। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে'। মন্দ্রসপ্তকে সুর ধরলেন ওঁর পরিচিত মঙ্গলমন্ত্রের পর। এক অপার্থিব সুর। মনে হল ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পৃথিবীর নাভি-মন্ডল থেকে উঠে আসছে এক স্বর্গীয় ওঙ্কার ধ্বনি। রাগ চারুকেশী কর্ণাটিক সঙ্গীত থেকে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে এসেছে। এক নিদারুণ বিষন্নতা আর আধ্যাত্বিকতার ছোঁয়া এই রাগে। মনে হলো এই সঙ্গীত বাইরে বসে শুনতেই বেশি ভালো লাগবে।

খুব সন্তর্পনে উঠে গেলাম বাইরে। যাতে শ্রোতাদের কারো অসুবিধা না হয়। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলাম।বেশ কয়েকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। উদ্যোক্তারা স্পিকারের সুন্দর ব্যবস্থা করে ফেলেছেন ততক্ষণে।যাতে বাইরে বসেও শ্রোতাদের শুনতে অসুবিধা না হয়। অন্ধকার একটু তরল হয়ে আসছে। জোলো, হিমেল হাওয়া। সোয়েটারের ওপর চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বেশ আরাম হলো। উল্টোদিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আলো। গঙ্গায় ভাটার স্রোতে অলস ভাবে ভাসতে থাকা কয়েকটা আলোর বিন্দু। হয়তো কোনো রাত জাগা নৌকোর।

একটা জুতসই জায়গা দেখে বসলাম সিঁড়ির ওপর। ঘাড় ঘোরালেই দেখা যাচ্ছিল প্রবীণ সঙ্গীত সাধককে।

সুরের জাল বুনে চলেছেন নিমগ্ন সুরের ধ্যানে। বিলম্বিত থেকে নিবদ্ধে। পুবের আকাশে আলোর হাল্কা ছোঁয়া। রাত নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলো আরেকটি দিনের আগমনের আয়োজনে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের রেখা ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। ওদিকে পণ্ডিতজি ধরেছেন তাঁর চারুকেশীর বিখ্যাত বন্দিশ --

'লাগেলা মোর মন তোসো

মোহে তুম বিন কালা না পরত রে ...'

সূর্যোদয়েরও একটা চলন আছে। সেদিন প্রথম মনে হলো। কালোর পাতলা হয়ে আসা। অনেকটা সময় ধরে বর্ণহীন এক অবস্থা। তারপর গোলাপি, কমলার নানা পর্দা ছুঁয়ে লালের ঘরে গিয়ে পড়া। দিনের মঞ্চে সূর্যের আবির্ভাব পাকা করতে।

এই সুরের ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। একটা শঙ্কা শুধু -- কিছুক্ষণের ভেতরে এই গান তো শেষ হয়ে যাবে। সেই শূন্যতা বড়ো তীব্র লাগবে। সেই বয়েসে ওই তীব্রতা সহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। মনে হলো এই সুরের ঢেউ চলাকালীন আমাকে ধীরে ধীরে সরে যেতে হবে। আমি বেরিয়ে পড়লাম।ওখান থেকে। ভেসে আসছিল তখনও চারুকেশীর সুরের মূর্ছনা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো, যতো এগিয়ে যেতে থাকলাম। ঠিক মিলিয়ে নয়, মনের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে থাকলো ক্রমশ।

****

পন্ডিত সুমন ঘোষ সংগীত মার্তণ্ড যশরাজজির প্রিয়তম শিষ্য। নরেন্দ্রপুর কলেজে আমার বছর খানেক সিনিয়র সুমনদা। ছোটো থেকে সঙ্গীত সাধনা করেন। নরেন্দ্রপুরে থাকাকালীন পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে ওঁর তালিম চলছিলো। কবে যে ধীর-স্থির, মিষ্টি স্বভাবের সুমনদার খুব কাছে চলে যাই আজ আর আলাদা করে মনে করতে পারছি না। ব্রহ্মানন্দ ভবনের প্রেয়ার হলের পাশে একটি ছোট্ট ঘরে সুমনদা প্রতিদিন বিকেলে রেওয়াজ করতেন। সাধারণত শিল্পীরা রেওয়াজ অন্য কাউকে শুনতে দেন না। কিন্তু সুমনদা আপত্তি করতেন না আমার উপস্থিতি। একমনে সুরসাধনা করতেন। আমি চুপ করে শুনতাম। দেখতাম এক সঙ্গীত-ছাত্রের শিল্পী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। উচ্চমাধ্যমিকের পর আমি নরেন্দ্রপুর ছেড়ে ডাক্তারি। সুমনদার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বছর পনেরো পর আন্তর্জালে কোনভাবে আমার সুমনদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। উনি তখন পন্ডিত সুমন ঘোষ। সংগীত মার্তণ্ড যশরাজজির খুব প্রিয় শিষ্য। আমেরিকার হিউস্টনে সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক প্রতিষ্ঠা করে বিদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত প্রচারের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

সুমনদার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়ে মনেই হলো না সেই স্নেহের সম্পর্কে সময়ের জন্য কোন ছেদ পড়েছিল কোনোদিন | নিয়মিত যোগাযোগ চলতে থাকলো | ফোনে, ফেসবুকে, পড়ে ওয়াটস-আপে |যখন তখন ফোন করি -- সঙ্গীত বা জীবন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করা যায় সুমনদার সঙ্গে | ইউটিউবে গান শুনি সুমনদার | এতো বড়ো একজন শিল্পীর কাছে আসতে পেরে ধন্য মনে হয় নিজেকে | সুমনদার কাছে এসে একটা জিনিস বুঝতে পারি | বড় শিল্পী সিরিয়াস শ্রোতাকে স্নেহ করেন |মনে করিয়ে দেন সঙ্গীতে রসিক শ্রোতার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে | যশরাজজির জীবনের নানা কথা বলেন | আরো বহু শিল্পী জীবনের কথা | যশরাজজির শরীর খারাপ হয়ে আসছিল | তবুও সঙ্গীত পরিবেশনা করতেন নিয়মিত | হিউস্টনে সুমনদার কাছে যেতেন | মেয়াতি ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আশীর্বাদ করতেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রাণভরে | গত জন্মাষ্টমীতে হিউস্টনে সুমনদার উৎসাহে এক অসাধারণ অনুষ্ঠান করেন যশরাজজি |

যশরাজজির গান শুনি নিয়মিত | সিডিতে, ইউটিউবে | বিলেতের লম্বা ড্রাইভে গাড়ির সাউন্ড সিস্টেমে ভেসে আসে ওঁর অসাধারণ খেয়াল, ভজন | এবছর মার্চ মাস থেকে করোনার প্রকোপে জেরবার মানুষ |সুমনদা নিয়মিত খোঁজ নেন | সাবধানে থাকার কথা মনে করিয়ে দেন | প্রার্থনা করেন আমরা যেন ভালো থাকি | ২৭ এ এপ্রিল ২০২০ | করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে | হাসপাতাল যাওয়ার পথে সেদিন চারুকেশী শুনছিলাম যশরাজজির গলায় | যতবার শুনি, নতুন করে ভালো লাগে | কাজে যাওয়ার পথে ওঁর সঙ্গীত অনেকটা শক্তি যোগায় | সেদিন ভালোলাগা বড়ো তীব্র হয়ে উঠলো | জানিনা কেন | সুমনদা কে মেসেজ করলাম যদি একবার যশরাজজির সঙ্গে দর্শনের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারেন | সুমনদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন | উনি নিউ ইয়র্ক আর মুম্বাইতে ভাগাভাগি করে থাকেন | দেশে গেলে আগে থেকে জানালে সুমনদা ব্যবস্থা করতে পারেন যশরাজজির সঙ্গে দেখা করার |

১৭ই আগস্ট ২০২০ | ইন্টারনেটে খবর পেলাম যশরাজজির চলে গেছেন | মনে হচ্ছিল অনেক ফেক নিউজের মতন ইন্টারনেটের এই খবরটিও যেন ভুল হয় | সুমনদাকে মেসেজ করলাম | উনি জানালেন সঙ্গে সঙ্গে যে ইন্দ্রপতনের খবর সঠিক |

জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি | অনেক কিছু পাইনি | কিছু জিনিস আর পাবো না | সেই আর না পাওয়ার তালিকায় আরেকটি যোগ হলো | বার বার মনে হচ্ছিলো এতো বছর ধরে সুমনদা সঙ্গে আমার যোগাযোগ, কেন আগে এই ইচ্ছেটা ওঁকে জানাই নি |

যশরাজজির মতো শিল্পীর মত্যু হয়না | সুরের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিয়ে যান আমাদের মত অগুণতি গুণমুগ্ধ শ্রোতাকে | সেই রঙ থেকে যায় | পাকাপাকিভাবে.....

কবিতা

আগুন

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

পাথরে নাচে আগুন
আগুন জ্বলে বুকে
মধুমাসে দেখা হলে প্রেম জানাবো তোকে
ভালোবাসা ভালোবাসা
আসিস ফিরে ফিরে
মনের কোনে আগুন জ্বলে সারা ফাগুন ঘিরে
আগুন নিয়ে করছি আমি লীলা
আগুন আমায় কি দেয়নি বলো?
প্রেমের পথে বড্ডো বেশি কাঁটা
তাই তো তোমার আঁখি ছলো ছলো
আগুন জ্বলে ভরা শ্রাবন ঘিরে
তাই তো প্রেম আসে ফিরে ফিরে
আগুন নিয়ে করছি আমি লীলা
আগুন আমায় দেয়নি কি বলো?
ফিরে ফিরে বিরহ এলে পরে
প্রেমের আগুন হয় যে টলো মলো
পাথরে নাচে আগুন
আগুন আমায় যন্ত্রণা দেয় বুকে
শ্রাবনের পর ভাদর এলে পরে
শ্রাবনের প্রেম না হয় যেন ফিকে
প্রেমের আগুন বৃষ্টি হলে ফিরে
মধু মাসে প্রেম জানাবো তোকে!

Anwesha

এক এক করে...

...এগারো

কবিতা

ফেলে আসা দুর্গা পূজা

মৌমিতা ঘোষ

রেডিওতে মহালয়া, রাঙা ভোরের আকাশ
বাজির শব্দ, আর গন্ধ ভরা বাতাস !
আর বাকি সাতদিন মায়ের আসার,
কতকিছু করা বাকি, হৃদয় তোলপাড় !

বাবার দেওয়া নতুন জামা, মায়ের দেওয়া শাড়ি
খাদিমসের জুতো আর, হাত ভরা কাচের চুড়ি,
বাক্স ভরা ইমিটেশন, সোনার চেয়ে দামী
বোনের সাথে ভাগাভাগি-
কোনটা তুই নিবি, কোনটা আমি !

পূজোর দিনের সকাল, অপরূপ আভা-
শিশির ভেজা ঘাস, আর শিউলির শোভা
সোনার রোদে ভরা স্নিগ্ধ বেলা,
নীল আকাশের বুকে, ভাসে শুভ্র ভেলা !

ষষ্ঠীতে মাকে আনি, সাজাই যতনে
সপ্তমী কেটে যায় মণ্ডপে বসে !
দল বেধে বন্ধুদের কত হাসাহাসি,
একটু ভাল লাগা, আর স্বপ্নের রাশি !
অষ্টমী নবমী প্যান্ডেল ভ্রমণ,
হঠাৎ চোখে চোখ, জাগায় হৃদস্পন্দন !
দশমীতে মুখ ভার, কান্না ভরা মন,
আসছে বছর আবার মা, এসোগো এমন !

দিনগুলো চলে গেছে সময়ের সাথে,
পরে আছে স্মৃতিগুলো কবিতার মাঝে !
সময়ের স্রোতে আজ ব্যস্ত জীবন,
তুমি মা একই আছো আগের মতন !

ভ্রমণ

সুমেরু কথা

অয়ন চক্রবর্তী

বাড়ির চাবি লাগানোর আগে বারবার করে দেখে নিচ্ছি বাড়তি একজোড়া উলের মোজা , টুপি , কয়েক জোড়া দস্তানা এসব ব্যাগে নেওয়া হয়েছে তো ? স্টকহোল্ম থেকে ট্রেন সন্ধ্যে ছটায়। বেরোনোর আগে শেষ প্রস্তুতি ; শহর কলকাতায় শীতে পারদ দশের নিচে নামলে ছোট থেকে দেখেছি টিভি রেডিও তে রে রে রব পরে, আর সেই হাড় মজ্জা স্টকহোল্ম থেকে ট্রেনে চড়ে সোজা আর্টিক পাড়ি দেবে ; বাড়ির চাবি থেকে উল এর মোজাটা যে বেশি দরকারি সেটা বোঝা কেশব অংকের মত কঠিন নয়।

ছয়তলা স্টকহোল্ম সেন্টার স্টেশনের মেন হল সেজেছে ক্রিসমাসের সাজে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ ছাড়া আর্টিক সার্কেল এর আর মজা কি। আর্টিক রেখা পেরোলে পৃথিবী কি সত্যিই ফ্ল্যাট ? পোলার সার্কেলে কি সত্যিই এই সময়টা 24 ঘন্টা রাত ? রেন্ ডিয়ার এর দৌড় , হাস্কি স্লেডের বরফ বিদারী শব্দ, অরোরা বোরিয়ালিস এর হাতছানি , এসব মাথায় গজ গজ করতে করতে যখন প্লাটফর্মে পৌঁছলাম সামনে দাঁড়িয়ে সেই পোলার সার্কেলের দুত যে ঘন্টায় 200 কিমি বেগে নাম-না-জানা কতশত বরফে ঢাকা গ্রাম, মফঃস্বল, শহর পেরিয়ে আমাদের নিয়ে পৌঁছে যাবে

সুইডেনের একদম উত্তরে। ট্রেনটা যাবে নরওয়ের উত্তর প্রান্তের ন্যার্ভিক বলে একটা ছোট্ট শহরে কিন্তু আমরা নেমে যাব আবিষ্ক ন্যাশনাল পার্কে। পকেট থেকে গলা বার করে 'সিরি' ম্যাডাম সাবধান করছেন আবিষ্ক তে আজ -21 ডিগ্রী সেলসিয়াস। উলের মোজা চামড়ার দস্তানা আর অনেকটা সাহসে ভর করে সস্ত্রীক বাঙালি উঠে পড়ল ট্রেনে। ঘড়ির কাঁটার সাথে যেন বাঁধা ট্রেনের চাকা ঠিক সন্ধে ছটায় শুরু হলো আবিষ্ক আবিষ্কারের যাত্রা। ট্রেনে একই কূপে সাথে এক নরওয়েজিয়ান পরিবার উঠলো, ন্যার্ভিক-এর কাছেই এক গ্রামে বড় হয়েছে ছেলেটি রুজি রোজগারের টানে অধুনা ভাইকিং এখন থাকে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্মে । তার কাছে নরওয়েজিয়ান ল্যাপল্যান্ড-এর অবাক করা সব গল্প শুনতে শুনতে কখন যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেললাম বুঝতেই পারিনি। বাইরে আলো নেই একটুও কিন্তু সাদা বরফ পৃথিবীর একটা উজ্জ্বল অস্তিত্ব উপস্থাপিত করে রেখেছে সাথে সাথে। এমনিতেই জনঘনত্বের বিচারে সুইডেনে একজন মানুষ ৬টা ফুটবল মাঠ নিয়ে থাকতে পারেন এরকম উপমা খুব জনপ্রিয় , কিন্তু আপনি যত উত্তরে যাবেন আপনার মনে হবে সংখ্যাটা কম করে ৭০টা ফুটবল মাঠ নিয়ে একজন মানুষ থাকলেও জায়গার অভাব হবে না। নৈশ ভোজ ট্রেনে সারা হলো। রেন ডিয়ারের মাংস দিয়ে পাউরুটি শেষে ব্ল্যাক কফি। রাতে ঘুমানোর আগে ল্যাপটপে আবারো চোখ বুলানো, সামনের চারদিনের কি রকম আবহাওয়া থাকবে, আকাশ মেঘলা থাকবে কিনা, নর্দান লাইটসএর ফোরকাস্ট কি ইত্যাদি। নরওয়েজিয়ান ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন ' ভায়া , সুমেরু বৃত্তে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রতি ঘন্টায় বদলায় ওসব অ্যাপ ট্যাপের ওপর ভরসা না করাই ভালো' । ভাইকিং মাপের কিং সাইজ বার্থে কম্বল টেনে লম্বা ঘুম লাগাল মধ্য চেহারার মধ্যবিত্ত বাঙালি। মনে হয় উত্তেজনার আলার্মেই, হঠাৎ চোখ খুলে ঘড়িতে দেখি সকাল সাতটা। বার্থ থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম কুপের বাইরে, জিপিএস এ দেখলাম সুমেরু বৃত্তের ভেতরে তখন ট্রেন ছুটে চলেছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। খানিক পরেই এল কিরুনা স্টেশন। ভাইকিং ভগবান ওডিনের করুণায় কিরুনাই সুইডেনের শেষ জনবসতি এরপর থেকে একরকম বনবাস থুড়ি বরফবাস বলা যেতে পারে। ট্রেন ছুটে চলেছে আর্টিক বৃত্তের মধ্যে দিয়ে একদিকে তোরনেতারস্ক লেক, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পর্বতমালার মাঝখানে বিশাল 330 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে তার বিস্তৃতি অন্যদিকে শ্বেতশুভ্র পর্বতমালা চিরে ট্রেন যখন আবিস্ক পৌছালো ঘড়িতে তখন সকাল 10:30 .

ট্রেন থেকে নেমেই প্রথম যেটা অনুভব করলাম সেটা হল শেষ দশ বছর শহর স্টকহোল্মে থেকেও ঠাণ্ডা কাকে বলে তা টের পায়নি। -২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাথে , বরফ জমা লেকের ওপর দিয়ে সুমেরু থেকে আসা দমকা হাওয়া , সাথে হিউমিডিটি আরও ঠান্ডা করে তুলেছে আবহাওয়া কে। 70° নর্থ আর 15 ডিগ্রী ইস্ট বলছে ফোনের কম্পাস , বুঝলাম এর থেকে কম ঠান্ডা আশা করা তাও আবার 27 শে ডিসেম্বরে , বাতুলতা হবে। চারিদিক বরফে ঢাকা, জেগে শুধু মাঝখানে একটা তামাটে-লাল স্টেশন-বাড়ি আর কিছু গেস্টহাউস দূরে দেখা যাচ্ছে। আমাদের সাথে গুটিকয়েক পর্যটক নামলেন ওখানে। বুকে বল পেলাম। অদ্ভুত একটা নীল আলোয় ভরে আছে চারিদিক কিছু জায়গায় কুড়ি সেন্টিমিটার কিছু জায়গায় 50 সেন্টিমিটার বরফ পেরিয়ে মিনিট পাঁচেক গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম। প্রায় পাঁচ লেয়ার শীতের জামা সোয়েটার জ্যাকেট পরেও ঠান্ডা লাগছে। চেক-ইন করার সময় দেখলাম রুমের চাবি দেওয়ার আগেই বলে দিল বাইরে আলাদা একটা ঘর আছে যেখানে আর্টিক জামাকাপড়ের ব্যবস্থা আছে , সেই ঘরে ঢুকে দেখি থরে থরে বিভিন্ন সাইজের সব পোশাক। আর কি ! সব থেকে ছোট সাইজের দিকে এগোলাম জুতো টুপি এবং নভশ্চর দের মত মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা স্যুট পড়ে বেরিয়ে এলাম। অনেকটা ধরুন দুটো লেপ গায়ে দিয়ে ঘোরার মত । ছোট্ট গেস্টহাউস সবাই সেখানে একই আলোর পথযাত্রী কিচেন বা অন্য সব কমন এরিয়াতে শুধু সেই সবই আলোচনা আজ রাত্রে সৌর ঝড় এর প্রকৃতি কি । নর্দান লাইটস দেখা যাবে কিনা , কোন ট্যুর গাইড ভালো , আইস-হোটেল কতদূর এইসব। হালকা আড়ি পেতে শুনলাম বাইরের নীল আলোর রহস্যও। বলছে এই সময়টা , মানে শীতকালে যখন প্রায় ছয় মাস রাত্রি তখন দুপুর নাগাদ 30 মিনিট খানেক এই অদ্ভুত নীল আলোর আবাহন ঘটে। পোলার বৃত্তে একে বলে ব্লু-আওয়ার। বরফ ঢাকা পোলার বিশ্বে গোটা এই ভৌগোলিক ব্যাপারটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। যাইহোক বাঙালি ভূগোল ছেড়ে গোল পেটের কথা ভাবল। এই কম জনবসতিতে একটি ছোট্ট দোকান সবই প্রায় পাওয়া যায় সেখানে। মিনিট চারেক হাঁটা পথ , কিছু খাবার মজুদ করা হলো আর দুপুরের আহার চটজলদি সেরে রওনা দিলাম রিসেপশনে। হাস্কি-স্লেজে যেতে হবে যে। বাঙালি বইয়ের পাতায় পরে , সিনেমাতে দেখে , গল্পের শোনে, হাস্কি কুকুর আর স্লেজ গাড়ির কথা, আজ সেই অভিজ্ঞতা হবে রক্তে-মাংসে। বুক করা ছিল আগেই। ট্যুরটা প্রায় তিন ঘন্টার। প্রথমে যেতে হবে ক্যানেলে মনে কুকুরদের আস্তাবলে। ট্যুর-গাইড বলে দিয়েছিলেন কোথায়। খুঁজে খুঁজে যাওয়া শুরু করলাম , বিস্তৃত বরফের উপত্যকা লেক মেঘ পাহাড় রাস্তা

কোনটা যে কার সাথে কোথায় মিলেছে কোথায় মিশেছে বলা খুব মুশকিল। মানুষের চলা পথের চিহ্ন অনুসরণ করে হাঁটছি , আর দূর থেকে তীক্ষ্ণ গলার তারস্বরে ডাক শুনে বুঝলাম ঠিক দিকেই যাচ্ছি। ক্যানেলে পৌঁছে দেখি এতো কুকুর নয় , প্রায় নেকড়ে বাঘ। তাদের কি তীব্র উৎসাহ। কিছু কুকুরকে তৈরি করা হচ্ছে আজকের স্লেজগাড়ী এর জন্য বাকিরা জালের ভেতর থেকে লাফাচ্ছে। তারাও যেতে চায়। একটা স্লেজ টানে বারোটা কুকুর , প্রধান কুকুর বা 'লিড-ডগ' সবার সামনে বাধা থাকে , বাকিরা তাকে অনুসরণ করে। এরা নেকড়ে বাঘের চেহারা ধারণ করলেও খুব মিশুকে। হয়তো অভ্যেসে বদলেছে স্বভাব। স্লেজ চলে প্রধানত দুটো লম্বা পাতের মত কাঠের উপর। প্রধানত অ্যাশ , বার্চ , হিকোরি বা ওক গাছের কাঠ থেকে বানানো হয়। এক একটা স্লেজ প্রায় আট ফুট লম্বা হয় আর তার সামনে বাঁধা বারোটা কুকুর। তারা লাফাচ্ছে , ডাকছে , আকাশ বাতাস বিদারিত হচ্ছে তাদের ডাকে। ঘড়িতে বিকেল তিনটে , প্রায় আঁধার , এক একটা স্লেজে চারজন বসবে। বাঙালি এই আয়োজন দেখে চকিত চিত্তে লাফ দিয়ে উঠে বসল একদম সামনে। যিনি চালক তিনি একদম পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। হাস্কিরা চালকদের কম্যান্ড বোঝে , ভাষা বোঝে , আওয়াজ বোঝে। শুরু হলো সেই বহু প্রতীক্ষিত ক্ষণ। পনেরো-কুড়ি কিলোমিটার বেগে বারোটা কুকুর দৌড়োচ্ছে। পাহাড়ের উপরে উঠছে , চড়াই -উতরাই , উতরাই চড়াই , তারা এই বিকেলের দৌড়টার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। হাড়হিম না হার কেটে যাওয়া হাওয়া , প্রাণ খুলে দৌড়োচ্ছে ওরা। কিন্তু আপনি ? আপনি তো আর নেকড়ে বাঘ নন আর ভাইকিং-ও নন , আপনার শীতকালে দীঘার সমুদ্রের জলও লাগে ঠান্ডা , যাক সে কথা- সে সব কথা ভাবার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন তীর বেগে ছুটে চলেছে 12 জন হাস্কি , পেছনে বাঙালি মারা গেলো কি বেঁচে আছে তা দেখার সময় তাদের নেই। চারিদিক ভয়ঙ্কর সুন্দর , বরফে ভর করে মেরুবাতাস গাল নাক চোখ-মুখ ছুঁয়ে আছড়ে পড়ে সুমেরু বৃত্তের নাম না জানা সব উপত্যকায়। দু'ঘণ্টা ধরে দৌড়াচ্ছে স্লেজ। -30 ডিগ্রী সেলসিয়াসে জনমানব শূন্য পাহাড়ে আওয়াজ বলতে স্লেজ-গাড়ীর বরফ কাটা , ৪৮টা হাস্কি-থাবার বরফের সাথে ঘর্ষণ , চালকের মাঝে মাঝে 'ইহা ইহা' করে ডাক আর আপনার হৃদপিন্ডের লাভ-ডুব। শেষ শব্দটা হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝে শুনে নিচ্ছিলাম। পেছনে বসা স্ত্রী তো জিজ্ঞেসই করলে 'কিগো বেঁচে আছো ?' দুই আড়াই ঘন্টা পরে যখন দৌড় শেষ হলো খুব মনে পড়ছিল উনার কথা। নিলয়ে অলিন্দে ,

লালমোহনবাবুর সাথে একটা আত্মিক যোগ উপলব্ধি করছিলাম, - ওনার শুধু উট ছিল আর আমার বেলায় হাফ নেকড়ে, মরুভূমি দুটোই শুধু রং টাই যা আলাদা।

বিস্তৃত আবিস্ক হ্রদের উপর দিয়ে। উত্তর দিকের আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, প্রচন্ড ঠান্ডা কিন্তু এ ত আর ম্যাজিক শো নয় যে আপনাকে সময় বলা হবে আপনি ঠিক সেইসময় যাবেন আর খেলা শুরু। এ হলো মহাজাগতিক এক

গেস্ট হাউসে ফিরে হালকা নুডলস খেয়ে দিলাম এক ঘুম। যুদ্ধ তো সবে শুরু। রক্তচলাচল তখন স্বাভাবিক হয়েছে আস্তে আস্তে। আসলে -25 এর পর রক্ত চলাচল যেন স্থবির হতে শুরু করে , বারবার নাক ঘষতে হয় , গাল ঘষতে হয় , যাতে রক্ত চলাচল করে। যুদ্ধ সবে শুরু বললাম তার কারন , আসল কাজ তো রাত্রে। সুমেরু প্রভা বা অরোরা বোরিয়ালিস -এর দেখা পেতে , আপনাকে গভীর রাত্রে ওত পেতে বসে থাকতে হবে একদম অন্ধকার জায়গায়। যেখানে লাইট পলিউশন বা আলোক দূষণ নেই, আকাশ হতে হবে পরিষ্কার। সৌর ঝড় এর জন্য নিক্ষিপ্ত পার্টিক্যাল ধাবিত হয় পৃথিবীর দিকে, এসে আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে। গতিবেগ থাকে প্রায় 70 মিলিয়ন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। কিন্তু পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের কল্যাণে এই শক্তি কণা গুলি বিক্ষিপ্ত হয় দুই মেরুর দিকে এবং সৃষ্টি করে মহাজাগতিক এক দ্যুতির। কফির ফ্লাস্ক , ক্যামেরা আর অনেকটা সাহসে ভর করে রাত এগারোটার পর আমরা রওনা হলাম আবিস্কর একদম পাথরের মতো জমে যাওয়া লেকের দিকে। মিনিট দশেকের হাঁটা , লেকের ওপর দিয়ে ট্রেন যেতে পারে এরকম শক্ত বরফ। হাটা শুরু হলো দিগন্ত উদযাপন। প্রকৃতির আপন মনের খেলা। এই বিশাল বৃহৎ উদযাপনে আপনি অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। এসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উত্তর আকাশ থেকে উত্তর আসলো। নীলচে সবুজ আলোর নদী ধীরে ধীরে যেন আকাশে জোয়ার আনছে , বেয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। দেখবো ,নাকি ক্যামেরা বের করব , নাকি ট্রাইপড দাঁড় করাবো , কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিনা। সারা আকাশ জুড়ে আলোর মেলা আর আপনি যখন ভাববেন যে এই আলো সূর্য বা চাঁদের আলো না কিংবা মানুষের সৃষ্টি করা আলোও না , তখন যেন সব কেমন গুলিয়ে যায়। বিজ্ঞান আর ম্যাজিক যখন মিলেমিশে একাকার হয় তখনই মনে হয় সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক কিছু। সারি সারি ক্যামেরা বের করে লোকজন সবাই পাগলের মতো বন্দী করতে চায় এই মুহূর্তকে। যে মুহূর্ত প্ল্যান করা যায়না , সৃষ্টি ও করা যায় না , যে মুহূর্ত শুধু মাত্র প্রাপ্তি হিসেবে মাথা নত করে ধন্যবাদ চিত্তে মেনে নিতে হয়। এ যেন তেমনি এক মুহূর্তের সাক্ষী হচ্ছি আমরা। আলোর নদী , উপনদী, শাখানদী কত কিছু হয়ে চলেছে আকাশের বুকে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারবেন আকাশের গায়ে নয় যেন পৃথিবীর কাছে এই আলোর জোয়ার। এই আলো

চন্দ্র সূর্য তারার মত অত দূরে দেখায় না ,দেখায় কাছে। সবুজ আকাশ , বেগুনি আকাশ , সুমেরু প্রভা ঘেরা ভয়ঙ্কর সুন্দর পৃথিবীকে দেখে নিজের সাথে নিজেই আত্মিক যোগের একটা অদ্ভুত অনুভুতি হচ্ছিল। বলে বোঝানো যাবে না সেই অনুভূতি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় এক উষ্ণ হৃদয় নিয়ে গেস্ট হাউজ ফিরলাম সেই রাতে। ঘুম আসতে কেন জানিনা বেশ দেরি লাগল।

পরের দিন সকালে হালকা আলো যতক্ষণ পেলাম কাজে লাগালাম ছোটখাটো হাইকিং করে দেখা মিলল একটি এল্ক আর তার দুই শাবকের। সুইডিশ ভাষায় যাকে বলে এলি। মুজস এর মতো দেখতে কিন্তু মুজস নয়। গরু ও ঘোড়ার মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। একটি মা আর তার দুই শাবক। মা অর্থাৎ মেয়ে তাই সিং নেই মাথায়। সাদা ধবধবে বরফে কালচে বাদামী রঙের তিন মূর্তিমান। এলি তো এল সাথে এলো তুষার ঝড় , ঠিক ধুলোর ঝড়ের মতো কিন্তু বরফকনা। গেস্টহাউস পর্যন্ত ফিরতে কালঘাম ছুটে গেল। সেদিনটা কাটলো মানব সভ্যতা আর বিজ্ঞানের অবদানে অর্থাৎ ঘরের ভেতর সুন্দর হিটার, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জানলার কাঁচের বাইরে ঝড় উপভোগ করতে করতে এল্ক গুলোর কথা একবারও মনে পড়েনি তা না কিন্তু তার থেকে বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম এই মানব জীবনকে। পরের দিন সকালে আইস হোটেল যাওয়া হবে- আবিস্ক থেকে দেড় ঘন্টা লাগে গাড়িতে| বরফের পাহাড় জঙ্গল ঘুরে ঘুরে আইস হোটেল পৌঁছতে পৌঁছতে আপনাদের আইস হোটেলের মজার এবং বিস্ময়কর গল্পটা বলি ।

এই হোটেলটা প্রতিবছর বানানো হয়। হ্যাঁ ঠিকই পড়লেন। প্রতিবছর গরমকালে একটি সম্পূর্ণ হোটেল গলে জল হয়ে যায় এবং শীতকালে সেটা আবার নির্মাণ করা হয়। উত্তর সুইডেনের জুকাসার্ভি গ্রামে অবস্থিত এই হোটেল সর্বপ্রথম নির্মিত হয় ১৯৯০ সালে। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস থাকে এই হোটেল। সম্পূর্ণ হোটেল, ভেতরের সব আসবাবপত্র খাট চেয়ার টেবিল সবকিছু বরফ দিয়ে বানানো। মানে ভাবুন একটা বিশাল বড়ো ইগলু। হোটেলের পেছনে তর্নে নদী , সেই নদীত সম্পূর্ণ জমে যায় আর সেই থেকে তৈরি হয় এই হোটেল এবং এপ্রিলের পর সম্পূর্ণ হোটেলকেই আবার ফিরিয়ে দেয়া হয় নদীতে , জল করে। নদী যখন গলতে শুরু করে ,তখনই বরফ তুলে জমিয়ে রাখা হয় কোল্ডস্টোরেজে। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা এসে শুরু করেন তাদের বরফ স্থাপত্যকীর্তি। 2022 সালে আমরা হোটেলের 32'তম বছর দেখলাম। পৌছানোর পরই ঢুকলাম রিসেপশনে। বিশাল বড় বরফের ঝাড়লন্ঠন ঝুলছে বরফের ছাদ থেকে। পাশেই বরফরের বার সেখানে বরফের গেলাসে সার্ভ করা হচ্ছে রকমারি ককটেল মকটেল। 55 টি রুমের এই হোটেলের প্রতিটি রুম ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অপরূপ সব সৃষ্টি , এক একজন শিল্পী নিজের শিশুর মত যত্ন করে বানিয়েছেন এক একটি রুম। খাটের ওপর বা বরফের সোফার ওপর পশুর চামড়া আর পশম পাতা, যাতে বসা যায়। ডিসকভারি , ন্যাট-জিও , বিবিসি আকছার ডকু বানিয়েছে এই

হোটেল নিয়ে কিন্তু চক্ষু চড়কগাছ কথাটা যে এভাবে মিলে যাবে তা নিজের চোখে হোটেলটা না দেখলে বুঝতাম না। রাত প্রতি ৪০,০০০ ভারতীয় মুদ্রায় আপনি এই হোটেলের একটি সুইটে থাকতে পারেন। হোটেলের ভেতরে কৃত্রিমভাবে -5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা হয় যাতে পারদ খুব নীচে না নেমে যায়। হোটেল থেকে যখন বের হলাম তখন বিকেল চারটে। সন্ধ্যে ছটায় ট্রেন ধরে ফিরতে হবে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে। ট্রেনের হর্ন যেন অ্যালার্ম ঘড়ি। স্বপ্ন ভেঙেছে এবার , ধাবিত হয়ে চলেছে ট্রেন বাস্তবের দিকে , শহরের দিকে। সুমেরু থেকে যাক সু-মেমারী হয়ে আর আমরা ফিরে চলি প্রতিদিনকার জীবনে। যেখানে ঘরবাড়ি প্রস্তরের ,যেখানে আকাশ শুধুই নীল বা মেঘলা , যেখানে তুষারঝড়ে এল্কদের কথা মনে পরে না, আর হাস্কিরা যেখানে বারান্দায় বাঁধা থাকে আর মানুষেরা বাঁধা থাকে জীবন যুদ্ধে।

এই ভ্রমণ কাহিনীটি ২০২২ সালে সানন্দা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। লিখনের এই সংখ্যায় এটিকে পুনর্বার মুদ্রিত করা হলো।

Anwesha

প্রবন্ধ

সিনেমার মতো বাস্তব

সায়ন্তন মিত্র (Kolkata Police)

'নায়কের নাম জেসন লেপচা'

'নায়কের সংজ্ঞা কী?' বা 'নায়ক কাকে বলে?'

সত্যিই কি নায়কের কোনো এক্সাক্ট ডেফিনেশন আছে?

বলা মুশকিল। তবে নায়ক বলতে গেলে এই চরিত্রটির কথা আমার বারবার মনে হয়। জেসন লেপচা, অটোচালক, কালিম্পং।

জেসনের কথা লিখতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আমাদের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরের একটি দেশে, আরো বছর কুড়ি আগে ঘটে যাওয়া অন্য একটি মর্মান্তিক ঘটনায়।

২০০৩ সালের মার্চ মাস। ইউরোপে মার্চ মাস মানে খাতায় কলমেই বসন্তকাল। কিন্তু প্রকৃত বসন্তের আগমনের ঢের দেরি থাকে তখনো। বরং থাকে ভয়ঙ্কর কুয়াশামাখা হিমশীতল শীতের আমেজ। সকালে রোদের দেখা মেলা ভার। সন্ধ্যে নামতেই কুয়াশায় মুড়ে যায় মহাদেশ।

এমনই এক শীতের রাতের ঘটনা। ইংল্যান্ডের সাউদ্যাম্পটন শহরের ক্রেগমিলান্ স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী হান্না ফস্টার (১৯৮৫-২০০৩) তার বন্ধুর বাড়ি থেকে রাত দশটা'র দিকে পার্টি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেদিন ছিল তার বন্ধু উইনি'র জন্মদিন। হান্না সেই বার্থডে পার্টিতে আমন্ত্রিত ছিলেন। বন্ধুর বাড়ি থেকে হান্না'র বাড়ি মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরের একটি কলোনীতে। পার্টির পর সব বন্ধুরা একসাথেই বেরিয়েছিল। বন্ধুদের সাথে তার শেষ সাক্ষাৎ হয় বাসস্ট্যান্ডে। হান্না ও তার আরেক বন্ধু সোভার পোর্টস্‌উড রোডের একটি বাসে চাপেন। এরপর হান্না নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে যান। স্টপেজ থেকে হান্নার বাড়ি প্রায় ৮০০ মিটার। কুয়াশায় ঢাকা সড়কবাতির টিমটিমে আলোয় নির্জন শীতের রাতে কোনো যানবাহন না পেয়ে অগত্যা হাঁটা শুরু করেন হান্না। মাঝপথে (একটি গ্যারেজ পেরোনোর সময়) অকস্মাৎ একটি মোটরভ্যান তার পিছু নেয়। নির্জন রাস্তায় মোটরভ্যানের চালক জোর করে তাকে ভ্যানে তুলে নেয় এবং সাউদাম্পটনের বাইরে ওয়েস্টেন্ডের অলিংটন লেনের একটি কার্ পার্কিং লটের পিছনে নিয়ে গিয়ে ভ্যানের মধ্যেই তাকে ভয়ঙ্করভাবে ধর্ষণ করে এবং নৃশংসভাবে খুন করে দেহটি জলাঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

যে ব্যক্তি এই নারকীয় কান্ডটি ঘটিয়েছিলেন তার নাম মনিন্দর্ পাল সিং কোহলি। মনিন্দর ভারতীয় অভিবাসী হিসেবে সাউদ্যাম্পটনের একটি ডেলিভারি সংস্থায় চাকরি করত এবং অবসরে ওই সংস্থার হয়ে ড্রাইভারিও করত। চন্ডীগড়ের বাসিন্দা মনিন্দরের স্ত্রী ছিলেন ব্রিটিশ। মনিন্দরের ভাই হরিয়ানা পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন।

এই ঘটনায় মনিন্দর ধরা পড়েছিলেন এবং ঘটনার পাঁচ বছর পর ২০০৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডের একটি আদালতে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। তবে এই কারাগৃহে যাত্রাটি যেমনটি সহজ মনে হয় তেমন সহজ ছিল না। আর এখানেই অবধারিতভাবে এসে পড়ে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাওয়া একটি নায়কের নাম, তিনি জেসন লেপচা। না, তাকে নিয়ে মিডিয়ায় কোনো প্রচার হয়নি, তিনি নিজেও কখনো মিডিয়ার সামনে আসেন নি। যাইহোক, সে কথায় পরে আসা যাবে। আগে মনিন্দরের ঘটনায় ফেরা যাক।

ধর্ষণ ও খুনের নারকীয় ঘটনাটি ঘটিয়ে মনিন্দর পরদিনই তার অফিস থেকে জরুরি ভিত্তিতে ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন এবং তিনদিনের মধ্যে চন্ডীগড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি এই বলে ছুটির আবেদন করেছিলেন যে বাড়িতে তার মা অসুস্থ।

এদিকে হান্নার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘটনার তিনদিন পরে। সাউদ্যাম্পটনের রাস্তায় যে গ্যারেজটি হান্না পেরোনোর পর মনিন্দর ভ্যান নিয়ে তার পিছু নিয়েছিল সেই গ্যারেজের অতি অস্পষ্ট সিসিটিভি ফুটেজ (কুয়াশার কারণে) থেকে সাউদ্যাম্পটন পুলিশ তিনধাপে অতি কষ্টে সনাক্ত করে ভ্যানটি। ভ্যানে পড়ে থাকা রক্ত ও সিমেনের নমুনার সাথে মিলে যায় হান্নার পোশাকে লেগে থাকা রক্ত ও সিমেনের নমুনা। যে ডেলিভারি সংস্থায় মনিন্দর্ কাজ করতেন সেখানকার খাতাপত্র ঘেঁটে এবং অন্যান্য কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় ভ্যানটি সে রাতে মনিন্দরই নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব মনিন্দরই যে

কালপ্রিট সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না পুলিশের। এখন দরকার তাকে অ্যারেস্ট করা এবং ঘটনা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হওয়ার জন্য মনিন্দরের ডিএনএ টেস্ট। কিন্তু মনিন্দর তো ততক্ষণে পগার পার।

মনিন্দরকে খুঁজে পেতে ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। ভারতের ব্রিটিশ অভিবাসন দপ্তর এই মর্মে হরিয়ানা হাইকোর্ট মারফৎ স্থানীয় থানায় একটি মামলা রুজু করেন। ভারতবর্ষের নিয়মানুযায়ী, আগে ভারতীয় পুলিশ তাকে ধরবে, তাকে মহামান্য আদালতে পেশ করা হবে, তারপর অন্ততপক্ষে হাইকোর্টের নির্দেশে (নিম্নআদালতে হবে না) বন্দী প্রত্যর্পন চুক্তি অনুযায়ী তাকে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে হস্তান্তরিত করা হবে। বোঝাই যাচ্ছে পদ্ধতিটি খুব সহজ নয়। ইতিমধ্যে বিষয়টি মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়ে যায়। আর বিপদের আঁচ বুঝতে পেরে মনিন্দরও হরিয়ানা থেকে পালায়। তদ্দিনে বছর গড়িয়ে গেছে।

বছর ঘুরতেই মিডিয়ার হইচই কমে আসে। মনিন্দরকে নিয়ে মিডিয়ার মাথাব্যথা কমতে থাকে। পুলিশের সক্রিয়তা কমে আসে। ঠিক এমন সময়েই হান্না ফস্টারের বাবা-মা ট্রেভর ও হিলারি ফস্টার ভারতে আসেন এবং ব্রিটিশ হাইকমিশন ও ভারতীয় মিডিয়ার সহায়তা চান। তারা দু'জনে সারা ভারতের প্রতিটি শহরে হেঁটে হেঁটে মনিন্দর সিং কোহলির পোস্টার, হান্নার ছবি, ঘটনার সারসংক্ষেপ লেখা লিফ্লেট্ জনগণের মধ্যে বিলি করে ঘটনাটি আরো বেশি করে প্রকাশ্যে আনেন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ পুলিশও মনিন্দরকে ধরে দেওয়ার জন্য পাঁচ মিলিয়ন (পঞ্চাশ লক্ষ) ভারতীয় টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল। বিষয়টি ভারতে রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যায়। মনিন্দরও এরপর বেশভুষা বদলায়। ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে ছেঁটে ফেলে চুল, বর্জন করে পাগড়ি। চলে আসে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পঙে। সেখানে রেডক্রসের উফের অধীনস্থ একটি ফুড ক্যাটারিং সংস্থায় কাজ নেয়। বিয়েও করে এক নেপালি মহিলাকে।

কালিম্পঙে মনিন্দর প্রায় বছর খানেক ধরে রয়েছে। অথচ কেউ জানেও না। এমনকি চন্ডীগড়ে তার পরিবারের লোকেরাও না। ইতিমধ্যে সে প্ল্যান করেছে সপরিবারে নেপালে পালাবার।

অতঃপর একদিন কোথাও একটা যাবে বলে মনিন্দর অটোয় চেপেছে। একটি বাসডিপোয় এসে সে অটোচালককে অটো থামাতে বলে। অটো থামবার মুহূর্তে (যাত্রীরা সব বসা অবস্থায়) মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে চালককে দেওয়ার সময় মানিব্যাগ থেকে মনিন্দরের পুরোনো একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি অটোর ভিতর পড়ে যায়। মনিন্দরের অস্পষ্ট তাড়াহুড়ো, বিক্ষিপ্ত আচরণ অটোচালকের মনে আগেই সন্দেহ জাগিয়েছিল। এমনকি মানিব্যাগ থেকে একটি কাগজ (বা ছবি বা যাইই হোক) ছিটকে পড়ে যাওয়ার পরেও মনিন্দরের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই!! যেন কোনোমতে ভাড়া মিটিয়ে পালাতে পারলে যেন বাঁচে!! ফলে মনিন্দর অটো থেকে নেমে চলে যাওয়ার পর সন্দিগ্ধ অটোচালক ছবিটি হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন একে কোথায় দেখেছি!! ইতিমধ্যে রাস্তার ধারের সুলভ শৌচাগারের দেওয়ালে মনিন্দরের 'ওয়ান্টেড' পোস্টারে চোখ পড়ে চালকের। চালক তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ছবিটা বের করে মিলিয়ে দেখেন। এতো হুবহু অনুরূপ।

কালিম্পঙের স্থানীয় পুলিশ লাইনের এক কনস্টেবলের সাথে এই অটোচালককের বেশ খাতির ছিল। নেপালী ভদ্রলোক কনস্টেবল ছেত্রী'জী পুলিশ লাইনের ক্যান্টিন চালাতেন। প্রায়ই বাজার-টাজার করে এই অটোচালকের অটোতেই ব্যারাকে ফিরতেন। অটোচালকটি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লাইনে গিয়ে ছেত্রী'জীকে সব জানালেন।

কনস্টেবল ছেত্রী'জী জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যারে তুই ঠিক দেখেছিস তো?"

- "একদম শিওর স্যার।"

- "ঠিকাছে চল্ আগে গিয়ে বাসটাকে আটকাই। মালটা শিওর পালাচ্ছে। পুলিশে খবর দেওয়াদেওয়ি করতে গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। ওই লোকটা ততক্ষণে অন্যদিকে পালাবে। বাস খুব বেশিক্ষণ হয়নি ডিপো ছেড়েছে। একটা ট্রাই নিয়ে তো দেখি। শোন্ তুই জোরে টানতে পারবি তো?"

- "একদম স্যার। "

অটো ঝড়ের গতিতে ডিপো'তে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে নেপালগামী বাসের খবর নিয়ে বাসরাস্তা ধরে। পাহাড়ি এলাকায় রুট্'ও তো একটাই। ফলে রাস্তা গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে, ছেত্রী'জী তো বাসডিপো থেকে ফোন করে লোকাল পুলিশকে ততক্ষণে খবরটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। আঁকাবাঁকা

চড়াই-উৎরাই বিপদসংকুল পাহাড়ি রাস্তায় ঝড়ের গতিতে চলে ততক্ষণে বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অটোরিকশা। তারপর বাসটিকে কোনোমতে হাইরিস্কে ওভারটেক করে আটকানো হয়। যাত্রীদের সহায়তায় আটকানো হয় মনিন্দর'কে। শেষে কালিম্পং পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাকে। আসলে 'কালিম্পং থেকে নেপালের উদ্দেশ্যে পালানোর চেষ্টা করার সময় মনিন্দর সিং কোহলি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন', এমনটাই লেখা হয়েছিল রিপোর্টে। আরো দু'বছর ধরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মিটমাট করে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানোর পরে মনিন্দর ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। ২০০৮ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ব্রিটিশ আদালত।

এই অটোচালকই ছিলেন জেসন লেপচা। সত্যিকারের গল্পের এক নায়ক ছিলেন যিনি তাঁর কাজ দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে গর্বিত করেছিলেন। কালিম্পঙের দরিদ্র অটোচালক জেসন লেপচা আমাদের রাজ্যের তথা দেশের গর্ব।

পরবর্তী ঘটনা এই মানুষটির প্রতি আমাদের আরো নত হতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ সরকার তাকে পাঁচ মিলিয়ন টাকা শর্তানুযায়ী দিতে চাইলে জেসন প্রথমে তা গ্রহণ করতে চাননি। অনেক অনুরোধের পর রাজী হন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফ থেকেও পুরস্কৃত করা হয় জেসনকে এবং সেই অফ্-ডিউটি (তথাকথিত) পুলিশকর্মীকেও।

জেসন এই টাকা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণে ব্যায় করেননি। বরং বহুজন হিতায় স্বপ্নপূরণে ব্যায় করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "জন্মেছিস যখন দাগ রেখে যা"। স্বামী বিবেকানন্দকে তো কখনো পড়েননি জেসন লেপচা। কিন্তু দাগ রেখে যাওয়ার মতো উদাত্ত বিরাট হৃদয় ও জ্বলন্ত বিবেক ঈশ্বর তাকে দিয়েই পাঠিয়েছিলেন সম্ভবত। তিনি জানিয়েছিলেন এত অর্থ থাকাটাই তাঁর কাছে বিলাসিতা। তিনি এত টাকার ভার বইতে পারবেন না। তাহলে?

দারিদ্র্যের কারণে জেসন লেপচা প্রাথমিকের পর কখনও স্কুলে যাননি। তবে নিজের ছেলেমেয়েদের এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্কুল খোলার স্বপ্ন তাঁর সবসময় ছিল। তিনি তাঁর স্বপ্নপূরণ করেছেন এবং পুরস্কারের প্রাপ্য ও নিজের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ দিয়ে কালিম্পঙের ছিমছাম একটি গ্রাম শান্তিগ্রামের দুতেরিয়া চা বাগানের ১ একর জমিতে একটি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হান্না ফস্টারের বাবা-মা সব ঘটনা জানতে পেরে জেসনের স্কুলে এসে জেসনকে আর্থিক সহায়তা করেন। জেসন হান্না'র নামেই স্কুলের নামকরণ করেছেন। কয়েক বছর আগেই সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে জেসনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে। গঠিত হয়েছে ট্রাস্টিবোর্ড। বিভিন্ন দেশের মোট সাতটি চ্যারিটেবল্ সংস্থা আর্থিক অনুদান দিয়েছে জেসন লেপচা প্রতিষ্ঠিত 'Hannah Memorial Academy'কে। জেসনের সহধর্মিণী ইসবেল্লা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান। মূলত পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, নিপীড়িত, বঞ্চিত পাহাড়ী শিশুদের জন্যই এই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন অনুমোদিত। মেধার ভিত্তিতে অ্যাডমিশন বা প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার নেই। জেসন লেপচার মহতী উদ্যোগকে সার্থক রূপায়িত ও সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে সমাজের বিশিষ্ট জনেরা এগিয়ে এসেছেন বারবার। আজ সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকমন্ডলী তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির হায়ার সেকেন্ডারি মর্যাদা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিরলস সাধনায় ব্রতী রয়েছেন। সগৌরবে সেই সাফল্য অর্জন করুক এই প্রতিষ্ঠানটি এই শুভকামনাই থাকুক আপামর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তরফ থেকে।

সাহস, নম্রতা এবং সৎকর্মই নায়কের অর্থ সংজ্ঞায়িত করে তার প্রমাণ জেসন লেপচা।

কবিতা

Fragments

Ashani Chakraborty

(1)

Broken pieces of destroyed minds,
Silent screams of tormented souls,
Ruined psyches.
Diseased bodies, diseased thoughts, diseased dreams,
Nightmares of dark alleys
Where beggars lay beside drains
With nothing to live for,
Why don't they commit suicide?

(2)

A dark room,
The power has gone out,
A teenage girl sitting on a chair
Staring at her bloody wrist
The pain acting as a distraction from the greater agony within,
In the other room her father lay in his disturbed sleep
Where his wife is staring at him through the window,
With unfathomable eyes
It's been a year since she left him.

(3)

Walls, walls and walls
Prisoners everywhere,
Tea stalls full of unthinking idiots,
Crowded buses stinking of lechery,
Children being butchered again and again
By those that gave them breath.
The stench of poverty,
The stench of sorrow,
The stench of life.

A VAST WASTELAND

Walking amidst a grey and desolate landscape,
No greenery anywhere,
I hear no music of the streams,
Nor the song of the birds;
The sky has turned a suffocating yellow,
For some reason unknown.
I long to see a dog or a cat or a squirrel,
But no sign of life can be seen.
No happy thought crosses my mind,
No sunlight pierces my heart
Which is damp and cold,
And in which a venomous scorpion is moving around restlessly.
Am I alive?
Maybe yes, as insects are
I keep on walking,
Through the vast wasteland.

A Broken World

Broken minds; Broken dreams; Broken images;
Empty beings filled with illusory mirages.
Grotesque memories and shattered lives,
All the honey has been sucked out of the bee hives .
Broken dreams lurking inside broken toys,
A realm full of dismembered girls and boys.
Bleeding bodies and bleeding souls,
Minds full of worm filled holes,
Travellers lost amidst the scorching sand,
Frantic swimmers in search of land.

MUSIC

The celestial angel with a delicate face
The tranquilizer of the complex human race .
The harbinger of eternal delight ,
That can cease our desire to fight
Replacing the mind's darkest corners with pleasure's light
Flowing through winds of immortal time
The lover who is forever sublime .
Creating a sweet paradise in the darkest depths of hell ,
Obliviating the fear of awaiting death's knell .

THOUGHTS

Floating through a sea of thoughts ,
Thoughts which flow like silvery wine.
Thoughts that pierce the clouds of cynicism ,
And allow my soul to shine .
They are free as the air ,
They glide like the river,
Above my mind they always hover .
They guide me in the darkest night ,
And preserve in me the will to fight.
They make me feel the warmth of life
And show me the thorny path to light .

কবিতা

পুনর্মিলন

মৌমিতা ঘোষ

চোখ ফিরে দেখতে চায়
আরো একবার ,
ভুলে যাওয়া মুখগুলো
ছিল যেন কার ?

কান কেন শুনতে চায়
সেই পরিচিত স্বর ?
একসময় শুনে ছিলাম
বারংবার !

আজও কেন পাই সেই
মাটির সুবাস ?
শিউলির গন্ধ আর
মাঠ ভরা কাশ ;

হৃদয়ের তানপুরায়
ধুলো জমে আছে ,
স্বরলিপি লেখা খাতা
হারিয়ে যে গেছে !

আশায় আছি দেখব ফিরে
আবার নতুন করে ,
পুনর্মিলন হবে আবার
এই বিশ্ব প্রাঙ্গনে !!

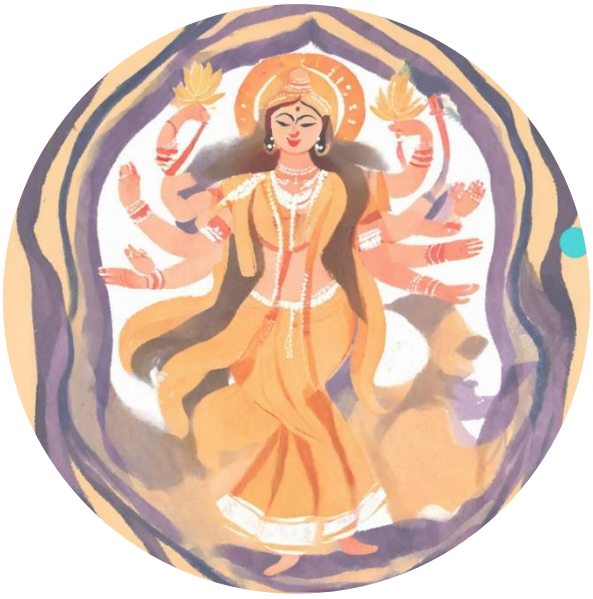

Anwesha

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বৎসর পূর্তি– সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অতি প্রিয় গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৩/০৭/১৮৯৭ সালে কাশীপুরের ভাড়া করা বাগানবাড়িকে লক্ষ্য করে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ও-বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত Association। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ।' কিন্তু কালক্রমে তিনি উপলব্ধি করলেন স্থায়ী মঠের প্রয়োজন। এই স্থায়ী মঠ হবে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের পীঠস্থান। কিন্তু কোথায় হবে সেই মঠ? কয়েকজন গুরুভাইকে তিনি বলেছিলেন, 'something tells me that our permanent Math will be in the neighbourhood across the river.'

রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে তাই কাশীপুর, বরাহনগর বা আলমবাজারের গুরুত্ব ব্যাপক হলেও বেলুড় মঠ, স্থায়ী মঠ হিসাবে তার স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। অখন্ডের ঘরের ঋষি নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ভাঙিয়ে এই জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন এখানকার মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য। ঋষি নরেন্দ্রনাথ স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য পৃথিবীর শুষ্ক ধূলায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - বাহ্য ত্যাগ এবং মনের ত্যাগ। গৃহীদের জন্য তাঁর নির্দেশ মনের ত্যাগের। সন্ন্যাসীরা বাহ্য এবং অন্তর ত্যাগ– দুই'ই ত্যাগ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী এবং গৃহীর জীবনে পূর্ণতা দানের জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যাপন করার জন্য স্থায়ী মঠের প্রয়োজন বিবেকানন্দ — তা বুঝেছিলেন অতি দ্রুত।

স্থায়ী মঠের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জমির সন্ধান করা শুরু হল। কামারহাটি, পানিহাটিতে গোবিন্দ চৌধুরীর বাগানবাড়ি, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি একাধিক জায়গায় জমির সন্ধান পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা বাতিল হয়। এদিকে তৎকালীন মঠ, আলামবাজার মঠবাড়িটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জমির সন্ধান শুরু হল জোর কদমে। অবশেষে সন্ধান পাওয়া গেল বেলুড়ের জমির। গঙ্গার পশ্চিম দিকে পাটনার বাসিন্দা ভাগবত নারায়ণ সিংহের থেকে ১৮৯৮ সালে ৪ মার্চ মাঝারি দুটি বাড়ি সমেত প্রায় বাইশ বিঘে জমি কেনা হল।

বেলুড় মঠ থেকে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের যে ভাব প্রবাহ শুরু হয়েছিল বর্তমানে সেই ভাব প্রবাহের ১২৫ বছর অতিক্রম করেছে। বেলুড় মঠের ভাব প্রবাহে সমগ্র সমাজপুষ্ট হচ্ছে। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতা নয় শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে মানুষের রুচিবোধ সর্বোপরি মানুষ হয়ে ওঠার এক অভিনব শিক্ষা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর আশ্বাস -

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

—"এইরূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হবে, আমি তখনই আবির্ভূতা হয়ে শত্রুবিনাশ করব" (চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)। পুরাকালের সেই দেব ও অসুরের লড়াই বর্তমানে আসলে অন্তর জগতে সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির লড়াই। আধুনিক এই মনোরাজ্যের সংগ্রাম পৌরাণিক দেব অসুরের যুদ্ধের থেকেও ভয়ঙ্কর। দৈনন্দিন জীবনে প্রসারিত হয়েছে এই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আসলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই শরীর। স্বামীজীর ভাষায় সংঘ শরীর। ভারতীয় ভাবনায় আছে, যখনই ভগবান আসেন একটি সম্প্রদায় তৈরি করে যান। সম্প্রদায় না হলে ভগবানের ভাব থাকবে না। কিন্তু এবারের সম্প্রদায় স্বামীজি চেয়েছেন উদারভাবের সম্প্রদায় হবে। যে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যই হবে পৃথিবীর কাছে প্রচার করা যে সাম্প্রদায়িকতা যাতে না থাকে। অর্থাৎ একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হবে রামকৃষ্ণ মিশন।

তরুণ বয়সে নরেন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের সন্ধান করছিলেন। নানা স্থানে অনুসন্ধান করেও তা না পেয়ে অবশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সাধক জীবনের পরম লক্ষ্য সমাধির আনন্দ লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন– এর চেয়েও উচ্চ অবস্থা আছে। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন– ব্যক্তিগত জীবনে সমাধির আনন্দ লাভ করাও স্বার্থপরতার নামান্তর। এই আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত সাধনা। এটিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও এটিই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। নরেন্দ্রনাথ এক নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। এখন থেকে ঘরে ঘরে, দেশে দেশে ও বিশ্বমাঝে এই বাণী প্রচার করাই হল তাঁর জীবন ব্রত। তাই সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে অবশেষে ঈশ্বরবিধানে বা শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ ইচ্ছাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন

আমেরিকার শিকাগো শহরে আয়োজিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে। সেখানে প্রচার করলেন যত মত তত পথ বাণী। পাশ্চাত্য জগত ভ্রমণ করে তাদের জাগতিক উন্নতি দেখে তিনি অভিভূত হলেন। সেইসঙ্গে তিনি ভারতের দৈন্যদশা দর্শনে হলেন পরম ব্যথিত। গভীর মননে উপলব্ধি করলেন পাশ্চাত্যের উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের সুসংহত সংগঠিত জীবন আর তার সঙ্গে শিক্ষার প্রসার। যার ফলে তিনি সংকল্প করলেন ভারতের উন্নতির জন্যও একটি সুসংহত সংগঠন স্থাপন করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে দীক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করতে হবে নতুন সাধন মার্গে। তাই ভারতবর্ষে ফিরে তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে কলকাতার বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন বৃহত্তর মানব জাতির কল্যাণের জন্য। আর এর নীতি হিসাবে স্থির করলেন– 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বাণী। যার অর্থ আত্মমুক্তি ও জগৎ কল্যাণ। এই কাজ ত্যাগী ও গৃহী সকলের সমন্বয় ও সম্মিলনেই সাধিত হবে। তিনি আরও স্থির করলেন পুরুষদের জন্য যেমন রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি নারীদের জন্য হবে নারী মঠ। পরবর্তীকালে যার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ সারদা মঠ। বর্তমানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদ। গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিয়ে যে সব আশ্রম পরিচালনা করছেন সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আরও সুসংহত হয়ে কর্মে ব্রতী হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অনুরাগ আর আন্তরিকতা থাকলে পূজা সার্থক হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে এই দুটি অভাব নেই। তাই ১৮৯৭ সালের ১ মে যে মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই ভাব প্রবাহ চলছে দ্রুত গতিতে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা যজ্ঞ দেখলে মানুষ বিস্মিত হয়। আত্মনিবেদিত সন্ন্যাসীরা মিশনের সম্পদ। শুধু সন্ন্যাসী কেন বহু গৃহী মিশনের সেবাযজ্ঞে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন।

কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলিতে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পড়ুয়ারা সফল হচ্ছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও শিক্ষা ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করে আসছে। বর্তমানে বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি সার্বিক শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ইটানগর হাসপাতাল, বৃন্দাবন, কনখল, লক্ষ্ণৌ, ত্রিবান্দ্রম সহ বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতালগুলি সেবা কাজ করে চলেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুব সম্মেলন, ভক্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যেখান থেকে আদর্শ জীবনযাপনের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি নিত্যদিনের জীবনে কি করে সেই আদর্শ কাজে লাগানো যাবে তা বলা হচ্ছে। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ত্যাগ ও সেবার বাণী বিদেশের শাখাকেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়ে সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কথায় আছে জগন্নাথের রথ এমনই চলে। তবে সেই ধন্য হয় যে রথের দড়ি স্পর্শ করার সুযোগ পায়। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছরের পুণ্য লগ্নে আপামর ভক্ত অনুরাগীরা সেবারথের সেই রশিতে হাত লাগিয়ে নিজেদের জীবন ধন্য করছেন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

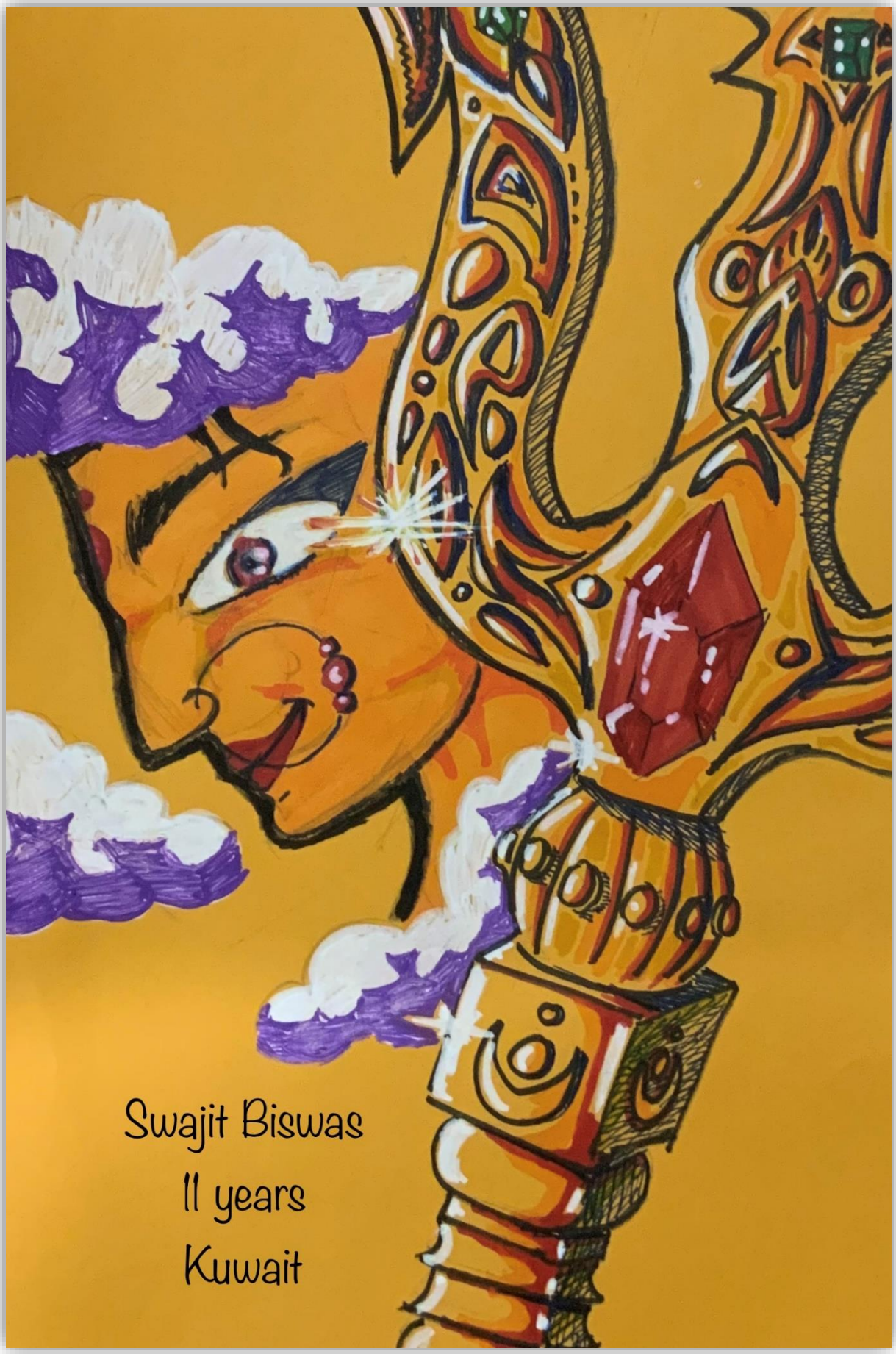

Swajit Biswas

প্রবন্ধ

ঠিকানা

সুচরিতা সেন চৌধুরী

১

শিয়ালদহ। শব্দটা ছোট, তবে তার ব্যাপ্তি মনের মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে। একটা অন্য অনুভূতি। ছোটবেলায় ছিল উত্তরবঙ্গ থেকে মামাবাড়ি আসা। আর এখন এই শহরের গতিময় জীবনকে ফেলে কয়েক দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ বা সিকিমের পাহাড়ে নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে যাওয়া। এই আসা-যাওয়ার সঙ্গে ওই ছোট শব্দটা সর্বদা জুড়ে রয়েছে। সে জোড়া এক অর্থে প্রান্তিক হয়তো। এ বার যদিও অনেক দিন পরেই শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেলে উঠেছে। জীবনে প্রথম বার একা এই পথে। তবে পাহাড়ের কাছে যাওয়ার সেই চেনা আনন্দটা টের পাচ্ছে সুচেতা।

দিল্লি যাওয়ার পর থেকেই উত্তরবঙ্গটা ভৌগলিক ভাবে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। সেই সময় মুসৌরি, শিমলা সঙ্গ দিয়েছে সুচেতাকে। কিন্তু হঠাৎই লকডাউনের বাজারে চাকরিটা চলে গেল। ফিরে আসতে হল কলকাতায়। দু'কামরার ফ্ল্যাটে টানা ছ'মাস আটকে থাকার পর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই ট্রেন চালু হতেই টিকিট কেটে বেরিয়ে পড়া। মা বায়না ধরেছিল, সঙ্গে যাবে। কিন্তু, সুচেতা এ বার একা হতে চায়। আসলে এত দিন ভিড়ের মধ্যে একাকিত্বের সঙ্গে লড়াই করে করে ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। এ বার সত্যিই একা হতে চায়। তাই মায়ের বায়নাকে প্রশ্রয় দেয়নি।

সাইড লোয়ার বার্থ। চাদরটা টেনে কাত হয়ে শুয়ে জানলার বাইরে চোখ মেলে ধরল। ইয়ার ফোনে 'দিল ঢুন্ডতা হ্যায় ফির ওহি ফুরসতকে রাত দিন...'। অন্ধকার চিরে একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ লেগে আসে।

প্রায় ঠিক সময়েই দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছল। এই স্টেশনের গন্ধ খুব চেনা। সেই ছোট্টবেলা থেকে যাতায়াত। বদলায়নি এত বছরেও। বেরিয়ে প্রি-পেড ট্যাক্সি বুথ থেকে পাকিয়ংয়ের গাড়ি ভাড়া করে সুচেতা। কাউন্টারের অল্প বয়স্ক ছেলেটি বেশ অবাক হয়েছে ওকে পাকিয়ংয়ের গাড়ি চাইতে দেখে। আসলে ট্যুরিস্ট স্পট নয় তো। কিন্তু সুচেতার বড্ড প্রাণের কাছাকাছি থাকে সিকিমের এই ছোট্ট গ্রাম।

গাড়ি মহানন্দা অভয়ারণ্য পেরিয়েই উঠে পড়ে পাহাড়ে। ডান দিকে বয়ে যাচ্ছে প্রিয় তিস্তা। মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়। উড়তে ইচ্ছে করে ওর। মনে হয় উড়ে সোজা পৌঁছে যাবে পাকিয়ংয়ে। মনে মনে বলে ওঠে, 'পাকিয়ং।' আর তখনই মনের কোণায় উঁকি দিয়ে যায় দীপেনের মুখটা। হালকা একটা ঠান্ডা হাওয়া জানলা টপকে সুচেতার মুখ ছুঁয়ে চলে যায়। এই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া নাক ও কত বার ঘষে দিয়েছে দীপেনের গালে। দীপেনকে মনে পড়ে।

কোথায় আছে? নিশ্চয়ই বিয়ে করেছে। সংসার করছে। ভাল থাকুক। মনে মনে বলে সুচেতা।

দুপুরের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে যায়। আগে থেকে বলা ছিল। কোন ঘর চাই সেটাও। দুপুরে খাওয়ার পরে হোটেল থেকে বাজারের চেনা রাস্তা পেরিয়ে কার্তোক গুম্ফার সামনে আসে সুচেতা। যেখানকার হাওয়ায়, গাছে, গুম্ফার দেওয়ালের প্রতিটি কোণায় লেখা রয়েছে দীপেন-সুচেতার ভালবাসার কাহিনি। চোখ বুজে অনুভব করে ও। দীপেনকে বড্ড মনে পড়ছে আজ। আর একটু যদি সাহস দেখাতে পারত সেই সময়! বা পরে কখনও। না আপসোস নেই। তবে ফাঁকা জায়গাটা রয়ে গিয়েছে আজও।

২

গুম্ফার পিছন দিয়ে একটা বাড়ির ছাদ অনেক ক্ষণ ধরে উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহল হয়। ওটা তো আগে এখানে ছিল না। ওই পিছনটা থেকেই তো উল্টো দিকের গ্যাংটক শহরকে রাতের অন্ধকারে মোহময়ী দেখাত। ওখান থেকে কত দিন সন্ধে নামতে দেখছে দীপেনের সঙ্গে। হাতে হাত রেখে। আর এই খালি জমিতেই স্বপ্নের বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখেছে। যার ছাদ হবে লাল, দেওয়ালের বাইরের রঙে থাকবে সবুজের ছোঁয়া। জঙ্গলের সবুজ। দরজা কিন্তু কাঠের রঙেই। দুটো-তিনটে ছোট্ট সিঁড়ি পেরিয়ে মূল দরজায় পৌঁছতে হবে। তার পরই সেই ভালবাসার ঘর।

ঘর সাজাতে সব সময়ই খুব ভাল লাগে সুচেতার। অগোছালো ঘর একদম পছন্দ নয়। দীপেনকে প্রথম থেকেই বলে রেখেছিল, "একদম অগোছালো করবে

না।'' দীপেন শুনে শুধু হাসত আর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত ওর মুখের দিকে।

গুম্ফার উঠোন পেরিয়ে সে দিকেই এগোয় সুচেতা। গুম্ফাকে ডান দিকে রেখে একটু চড়াই, কিছুটা খাড়া, এ রকম ছিল তখনও। দীপেন হাত ধরে ওকে তুলে নিত উপরে। না হলে খালি পা-পিছলে যেত সুচেতার। ভাবতে ভাবতে হাসি পায়। কষ্ট করে কোনও রকমে পিছলে পড়তে পড়তে উঠে আসে সেই জায়গায়। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সেই লাল ছাদ, সবুজ দেওয়াল আর কাঠের দরজা। সামনে খানিকটা ঘাসের লন। সেটা পেরিয়ে পৌঁছতে হবে দরজার সামনে।

সুচেতা ভাবে, তার স্বপ্নটা এ ভাবে কে চুরি করল? ছোট্ট এক ফুটফুটে লামা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসে তার দিকে। একগাল হেসে একটা চাবি এগিয়ে দেয় সুচেতার হাতে। সুচেতা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে পালিয়ে যায় সে।

চাবিটা ভাল করে দেখে সুচেতা। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'অ্যাবোড অব লভ', ভালবাসার বাসা। এত ক্ষণ খেয়াল করেনি, বাড়ির গেটেও বড় বড় করে লেখা ওই তিনটি ইংরেজি শব্দ। এই নামটাই তো ঠিক করেছিল ওরা! মনে একরাশ প্রশ্ন নিয়েই লনে পা রাখে।

লন পেরিয়ে 'লক' খুলে ঘরের ভিতর ঢোকে সুচেতা। জেসমিন রুম ফ্রেশনারের গন্ধ। বসার ঘরে সেই গোল করে ঘোরানো সোফা। তার সামনে কাচের টি-টেবল। দেওয়াল জুড়ে বিশাল এক টিভি, সাদা নেট দিয়ে ঢাকা। ড্রইংরুম লাগোয়া কিচেনের সঙ্গেই কাঠের ডাইনিং টেবল। সব ক'টা জানলায় সাদা-গোলাপি পর্দা। বেডরুম, গেস্টরুম পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুচেতা। দূরে দেখা যাচ্ছে গ্যাংটক শহর। একটা ইজি চেয়ার হাওয়ার ছন্দে একা একাই দুলছে বারান্দায়।

চেয়ারটায় হাত রাখে সুচেতা।

''তোমার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষায় রয়েছে। এক বার বসো,''— পিছন থেকে স্পষ্ট বাংলায় ভেসে আসে দীপেনের গলা।

পিছনে তাকাতে সময় নেয় সুচেতা, ভিতরের উথালপাথালটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। কষ্ট হচ্ছে না আনন্দ, বুঝতে পারে না। দীপেন আজও বাঁচিয়ে রেখেছে ওদের ভালবাসাকে! ঠিক যে ভাবে ও চেয়েছিল, সে ভাবেই। দীপেনের মুখোমুখি দাঁড়ায় সুচেতা।

''তুমি এখানে?'' প্রশ্ন করে সুচেতা।

''এখানেই তো থাকার কথা ছিল,''— বলে দীপেন।

এ বার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুচেতা, ''এই পোশাক কেন পরেছ তুমি?''

সুচেতার উত্তেজনাটা বুঝতে পারে দীপেন। বলে, ''মানুষের মধ্যেই আছি। মানুষের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছি।''

কত দিন পর ওরা আবার মুখোমুখি। যদিও অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। দীপেনের গায়ের ওই পোশাক অনেক কিছু বদলে দিয়েছে। ভেঙে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলায় সুচেতা। ওর দীপেন ওরই আছে। ও নিজেও তো কারও হতে পারেনি এত বছরে।

''এ ভাবে সব কিছু বাঁচিয়ে রেখেছ তুমি?''

দীপেন মুচকি হাসে। সেই চেনা লাজুক হাসিটা একই রয়েছে।

''তোমার মতো করে কেউ ভালবাসেনি যে আর। আমি তো তোমার জন্যই আজও বেঁচে থাকার শক্তি পাই। তাই একটু একটু করে সব স্বপ্নকে তোমার জন্য সাজিয়েছি। যদি কখনও আসো,''— দীপেনের কথার সঙ্গে সূর্যটা ঝুপ করে ডুবে যায় পাকিয়ংয়ের আকাশে। একটা একটা করে আলো জ্বলে ওঠে দূরের গ্যাংটকে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে সুচেতার। কিন্তু ওই মেরুন রঙের পোশাক দু'জনের মাঝে দেওয়াল তুলে দিয়েছে যে সারা জীবনের জন্য!

৩

দীপেনের পর সুচেতা প্রেমে পড়েনি এমনটা নয়। গত ১৫ বছরে একাধিক বার। হাবুডুবুও খেয়েছে। কিন্তু কোনওটাই টেকেনি। এই তো বছরখানেক আগেই শেষ প্রেমটা কেটেছে।

তার পরেই নতুন চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল। সাংবাদিকতা, সংবাদমাধ্যম ওর কাছে নেশার মতো। খবরের নেশায় বাঁচে। লকডাউনের বাজারে সব থেকে বেশি বিপদে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। চোখের নিমেষে সব চাকরি হারাচ্ছে। সেই দলে নাম লিখিয়েছে সুচেতাও। তার আগে কলকাতায় এসে আটকা পড়েছিল। বাড়ি থেকেই কাজ করছিল। কিন্তু সেটাও শেষমেষ ঘুচল হঠাৎই। একটা ই-মেলেই।

মনে মনে ভেবেছে, ভালই হল। একটু নিজের জন্য সময় পাওয়া যাবে এ বার। কত দিন নিজের জন্য কিছু লেখেনি। বাড়িতে বসে হবে না। তার মধ্যে নবনীতাও একটা গল্পের আবদার জানিয়েছে ওর পত্রিকার জন্য।

বইমেলায় ছোটগল্পের একটা সংখ্যা বার করবে। সবটাই একসঙ্গে হয়ে যাবে।

পাকিয়ংয়ে দীপেনের স্মৃতি ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সেটা ভাবেইনি সুচেতা। ও ভেবেছিল, পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নিয়ে হয়তো কোথাও চলে গিয়েছে দীপেন। পড়াশোনার কথা মনে পড়তেই... দীপেন পড়াটা শেষ করেছিল তো আদৌ? কাল জিজ্ঞেস করে নেবে।

হোটেলের ঘরের জানলা দিয়ে সেই রাতে অনেক ক্ষণ আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠা গ্যাংটককে দেখল সুচেতা। আগে এই জানলা দিয়ে কত দেখেছে গ্যাংটককে।

সকাল হল হোটেলের ছেলেটির ডাকে। চা নিয়ে হাজির। সকাল সকাল ডেকে দেওয়ার কথা বলাই ছিল। চায়ের কাপ নিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় সুচেতা। পুরো পাকিয়ং ঢেকে রয়েছে মেঘে। এই মেঘলা পাহাড় বড্ড প্রিয় ওর। গায়ে মেঘ মাখতে মাখতে পাহাড়ের আনাচকানাচ হেঁটে বেড়াতে চিরকাল পছন্দ করে ও।

এ ভাবেই এক দিন একা একা হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। একে তো মেঘলা তার উপর সন্ধে হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি। রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। থাকলেও ওই জঙ্গলে তাতে নেটওয়ার্ক থাকত কি না সন্দেহ। সেই ভয় পাওয়া পরিস্থিতিতে সুচেতাকে উদ্ধার করেছিল দীপেন। সেই প্রথম দেখা। তখন নেপালি ছাড়া কোনও ভাষাই ভাল করে বলতে পারত না। মনে আছে, ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলেছিল, উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর কলেজ যায়নি।

সে দিন সুচেতাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে দীপেন বলেছিল, ''অওর অকেলে মত জাইয়েগা। মুশকিল হো জায়েগা।''

সুচেতা বলেছিল, ''ওই রাস্তাটা কোথায় শেষ হয়েছে সেটা যে আমি জানতে চাই!''

''এক দম নীচে, মেন রোড পে। লেকিন জঙ্গলকে অন্দর রাস্তা নেহি হ্যায়। আপ জা নেহি পাওগে।''

''মুঝে জানা হ্যায়,''— সুচেতার জেদটা বড্ড বেশি।

সেই প্রথম দীপেনের লাজুক হাসিটা দেখেছিল সুচেতা। মৃদু স্বরে বলেছিল, ''কিতনে বাজে জানা হ্যায় বোলিয়ে, ম্যায় আ জাউঙ্গা।''

দুপুরের খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিল সুচেতা। দীপেনও সময়ের আগে চলে এসেছিল।

পাহাড়ে গেলে এটা ওর অভ্যেস, একা একা হেঁটে বেড়ানো। তাই বাড়ির লোকেরা কেউ খুব একটা এই বিষয়টায় ঢোকে না। কিন্তু কাঠখোট্টা, ডাকাবুকো সুচেতা যে এমন ভাবে প্রেমে পড়বে, সেটা ওর পরিবার কেন ও নিজেও বোঝেনি। আসলে সুচেতাকে টেনেছিল দীপেনের কেয়ারিংনেস। ওই যত্নশীল স্বভাবটাই সব সময় সুচেতাকে টানত।

সে দিন হোটেলে ফিরতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল সুচেতার। কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও কিছুটা হাল্কা। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ছোট ছোট ঝর্নাও। কোনও কোনও জায়গায় রাস্তা নেই, থাকলেও কাদা। সেই সব জায়গা সুচেতাকে হাত ধরে পার করেছে দীপেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বলেছে ওরা। আসলে সুচেতা প্রশ্ন করেছে, আর জবাব দিয়েছে দীপেন। বড্ড কম কথা বলে ছেলেটা। আসলে ভাষার সমস্যাটাও একটা কারণ।

কিন্তু ওই ছোট্ট জঙ্গলটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সুচেতা। মেন রোডে নেমে এসেছিল ওরা একটা সময়। সেখানে পাহাড়ে বিরাট ধস নেমেছিল কিছু দিন আগে। এখনও তার ছাপ স্পষ্ট। উল্টো দিকের রাস্তাটা বসে গিয়েছে পুরো। সুচেতা সেই ধসের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই দীপেন কাল যাওয়ার কথা বলে। ওখানে গেলে রাত হয়ে যাবে। মেনে নেয় সুচেতা। মেন রোড থেকে স্থানীয় একটা গাড়ি থামিয়ে তাতে উঠে পড়ে ওরা। সুচেতাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় দীপেন। হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দীপেনকে যেতে দেখার দৃশ্যটা অদ্ভুত একটা অনুভূতির জন্ম দেয় সুচেতার গভীরে। বুঝতে পারে না ও। পরের দিনের অপেক্ষাটা যেন অস্থির করে তোলে ক্রমশ।

পর দিন দীপেনের সঙ্গে সেই ধসের জায়গায় অনেকটা সময় কাটায় সুচেতা। ধ্বংসের মধ্যেই প্রেমটা চেপে বসে দু'জনের ভিতরে। অনুভব করে দু'জনেই। কিন্তু কেউ কাউকে বলে উঠতে পারে না। দীপেনের হাত ধরতে ইচ্ছে করে সুচেতার। এ দিন বাইক নিয়ে এসেছিল ও। বাইকের পিছনে বসে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু, সংশয় কাজ করে।

পরের দিন ফেরা সুচেতাদের। সিকিমের প্রথম এয়ারপোর্ট হচ্ছে পাকিয়ংয়ে। তার কাজেই ওর বাবাকে মাঝে মাঝে এই গ্রামে আসতে হয়। বাবা আসে তাই সঙ্গে ও, মা আর ভাইও। পাহাড়ে কয়েকটা দিন কাটানোর এই সুযোগ ওরা কেউই ছাড়তে চায় না।

সুচেতা ভাবে, এর পর থেকে সোজা এক-দেড় ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাকিয়ং পৌঁছে যাওয়া যাবে।

যদিও দীপেন মোটেও খুশি না এয়ারপোর্ট হচ্ছে বলে। ওর মতে, ওদের গ্রামের সৌন্দর্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে। পাহাড় কাটা হচ্ছে। কেটে ফেলা হচ্ছে গাছ। এর পর গ্রামটা বাঁচলে হয়।

সুচেতা বলে, ''বাঁচবে বাঁচবে... আমি এখানে একটা বাড়ি বানাব।''

দীপেন বলে, ''ক্যায়া হোগা ঘর বানাকে, আপ তো ইহা পর নেহি রহোগে।''

''আমি এক দিন এখানে এসেই থাকব, দেখে নিও।''

সুচেতার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে চলে যায় দীপেন।

৫

পাহাড়ি বাঁক ঘুরতে ঘুরতে সমতলের পথ ধরে সুচেতাদের গাড়ি। রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে দার্জিলিং মেল। তিস্তা বাজারে চা খেতে দাঁড়ায় ওরা। টানা অত ক্ষণ গাড়িতে বসে সবার পিঠে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। সুচেতার হঠাৎ মনে পড়ে, দীপেন তো একটা কাগজ দিয়েছিল! ভুলেই গিয়েছে ও। তিস্তা বাজারে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সাইড ব্যাগের পিছনের চেন থেকে কাগজটা বার করে সুচেতা। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'আই লাইক ইউ।' সঙ্গে একটা ফোন নম্বর আর তার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা '২ পিএম-৩ পিএম'। সুচেতার মনে পড়ে যায়, দীপেন বলেছিল, ওর বাবা যখন দুপুরে লাঞ্চ করতে যায় বাড়িতে, তখন ও দোকান সামলায়। এটা সেই দোকানেরই ফোন নম্বর, বুঝে যায় সুচেতা। ওদের গার্মেন্টসের ব্যবসা। পোশাক তৈরি করে। সেগুলো এখানে বিক্রি করার পাশাপাশি গ্যাংটকের মার্কেটে যায়। কখনও শিলিগুড়িতেও। পড়াশোনা ছেড়ে বাবার ব্যবসার কাজেই হাত লাগিয়েছে দীপেন।

তিস্তা বাজারে দিদির দোকানে চা খেয়ে আবার গাড়ি চলতে শুরু করে। ড্রাইভারের পাশের সিটে সুচেতা। বাবা, মা, ভাই পিছনে। পাহাড়ের এই চির চেনা রাস্তাটাও যেন আজ বড্ড অচেনা লাগছে। অদ্ভুত একটা সৌন্দর্যে ঢেকে গিয়েছে চরাচর। পেটের ভিতরে কেমন একটা গুড়গুড় ভাব। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে মনটা কেমন ভার হয়ে যায়। দীপেনকে মিস করছে কি?

পর দিন সকালেই কলকাতা পৌঁছে সবাই আবার নিজেদের জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবার অফিস, ভাইয়ের স্কুল আর মায়ের স্কুলে পড়ানো। সুচেতা তখন বেকার। গ্রাজুয়েশন হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার পর কী করবে? ঠিক করে উঠতে পারেনি। সবাই বেরিয়ে গেলে ঘড়ির কাঁটা দেখে চিরকুটের নম্বরটা ডায়াল করে সুচেতা। দুটো রিং হতেই উল্টো দিকে সেই চেনা গলা। 'হেলো' বলার পর দু'জনেই চুপ করে থাকে কিছু ক্ষণ। সুচেতা জানে, ও কথা না বললে দীপেন চুপ করেই থাকবে। ও যা লাজুক!

সুচেতা বলে, 'আই মিস ইউ'। ও পাশ থেকে দীপেনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। সুচেতা এ বার বলে, ''কুছ তো বোলো।'' আমতা আমতা করে দীপেন বলে, 'আই মিস ইউ টু'। কেঁপে ওঠে সুচেতা। সেই ফোনে আর ভালবাসার কথা বলা হয়নি। দুপুর দুটো বাজলেই ফোনের জন্য উসখুশ করতে শুরু করত দু'জন। এক দিন ভালবাসার কথাও বলে ফেলে।

তিতাসের সঙ্গে সবটা শেয়ার করে সুচেতা। প্রিয় বন্ধুকে সবটার সঙ্গে এটাও জিজ্ঞেস করেছিল, ''ভালবাসা, প্রথম প্রেমে পড়া এমনই হয় বুঝি?'' তিতাস সে সবের উত্তর না দিয়ে আশঙ্কার কথা বলেছিল, ''তোর বাড়ি মানবে না, এগোস না। কষ্ট পাবি।''

কিন্তু, সুচেতা নিজেকে আটকাতে পারেনি। বাবার পরের ট্রিপের অপেক্ষায় দিন গোনে।

৬

সেই দিনও এসে যায়। ছ'মাস পর সুচেতা দেখবে দীপেনকে! উত্তেজনাতেই কেটে যায় পুরো সফর। ভাল লাগা, ভালবাসার কথা জানানোর পর তো আর ওরা মুখোমুখিই হয়নি! প্রথমে খুব লজ্জা লাগবে। আর ও যা লাজুক, তাতে সুচেতাকেই আগে কথা বলতে হবে। আগের দিন সুচেতা ফোন করে দীপেনকে জানিয়ে দিয়েছিল, ও আসছে। আনন্দে কিছু বলতে পারেনি দীপেন। শুনেই ফোনটা রেখে দিয়েছিল।

পাকিয়ং পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়। খাওয়াদাওয়া সেরে সকলেই একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে হাঁটতে বেরোয়। দীপেনদের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আড় চোখে দেখে সুচেতা। দোকানে দীপেনের বাবা বসে। সন্ধে হওয়ার আগেই হোটেলে ফিরে আসে ওরা। পর দিন থেকে বাবার কাজ শুরু। এ বার মাঝে এক-দু'দিন গ্যাংটকেও যাওয়ার

কথা আছে। মা বলেছে, থাকবে ওখানে। সুচেতার মোটেও ইচ্ছে নেই। কিন্তু যেতে তো হবেই। ওকে একা রেখে কেউ যাবে না।

পর দিন সকালেই হোটেলের বাইরে দেখা হয়ে যায় দীপেনের সঙ্গে। দুপুরে খাওয়ার পর জঙ্গলে যাওয়ার প্ল্যান করে সুচেতা। দীপেন জানায়, আজ অন্য জঙ্গলে নিয়ে যাবে। রাজি হয়ে যায় ও। হোটেল থেকে বেরিয়ে, মূল বাজার পেরিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে ওরা।

এতটা রাস্তা কেউ কোনও কথা বলেনি। সুচেতাই জানতে চায়, ''আমরা কোথায় যাচ্ছি?'' দীপেন বলে, ''কার্তোক গুম্ফা। উসকে পিছেহি এক জঙ্গল হ্যায়।'' ওরা আবার হাঁটতে শুরু করে। এই প্রথম কার্তোক গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। শান্ত পরিবেশে মনটাও শীতল হয়ে যায়। কিছু ক্ষণ গুম্ফা চত্বরে কাটিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে। বেশ গভীর সেই জঙ্গল। মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হয়েছে রাস্তা। যত এগোচ্ছে তত জঙ্গল গভীর হচ্ছে। ওরা কেউ কোনও কথা বলে না।

সন্ধ্যা নামছে দেখে ফেরার পথ ধরে। তখনই গুম্ফার পিছনে সেই চাতালটা আবিষ্কার করে সুচেতা। দীপেনকে জিজ্ঞেস করে, ''এটা কার জায়গা?''

দীপেন বলে, ''ইয়ে মনাস্ট্রিকা হি হ্যায়।''

''আমি চাইলে আমাকে দেবে?'

''পাতা নেহি, লেকিন তুম কেয়া করোগে ইয়ে লেকর?''

''আমাদের বাড়ি বানাব এখানে।''

''হামারা?''

''হ্যাঁ,''— বলে দীপেনের হাতটা চেপে ধরে সুচেতা। বলে, ''কেন আমাদের বাড়ি হতে পারে না এখানে?''

দীপেন বলে, ''হোগা, জরুর হোগা। তুম চাহোগে তো সব হোগা।''

ফেরার পথে দীপেন জানায় ও গ্যাংটকের কলেজে ভর্তি হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে। উচ্চ মাধ্যমিকে বায়ো-সায়েন্স ছিল। গাছ, পাতা নিয়ে আগ্রহও প্রবল। ওর ইচ্ছে ভেষজ মেডিসিন নিয়ে কাজ করবে কখনও। পাহাড়ে সেটা সম্ভব। পাহাড়ে ডাক্তার, ওষুধের বড্ড অভাব। বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় মানুষকে। সুচেতার ভাল লাগে শুনে।

ও বলে, ''এখানে তো একটাই বড়লোকদের স্কুল। গরিবদের পড়তে অনেক দূরে যেতে হয়। আমরা একটা স্কুল বানাব।''

দীপেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

৭

কার্তোক গুম্ফা ওদের প্রেমের কাহিনি লিখত প্রতি দিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা কাটিয়ে দিত ওই জঙ্গল আর গুম্ফার চাতালে। কখনও স্বপ্নের বাড়ির খালি জমিটায়। সে বার অনেক দিন থাকতে হয়েছিল ওদের। ওখানে থেকে যাওয়ার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ানোর চাকরির চেষ্টাও করেছিল সুচেতা। কিন্তু বিষয়টা যে অতটা সহজ নয়, বুঝেছিল।

এ রকমই এক সন্ধেয় ঘুরে ফেরার সময় দু'জনকে একসঙ্গে হাত ধরে হাঁটতে দেখে ফেলে সুচেতার বাবা। ওরা দেখতেই পায়নি। দীপেন-সুচেতা নিজেদের মধ্যেই ডুবে ছিল। হোটেলে ফিরে সুচেতা টের পায়, সবার গম্ভীর মুখ। মায়ের জেরার মুখে পড়তে হয়। ভয় বলে কোনও বস্তু কোনও দিন সুচেতার মধ্যে ছিল না। সবার সামনে স্বীকার করে নেয়, ও দীপেনকে ভালবাসে। পরিস্থিতি জটিল হয়। তিতাস ঠিকই বলেছিল।

পরের দিনই ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সুচেতা শেষ বারের মতো দীপেনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায়। সে দিন আর কাতোর্ক গুম্ফায় যায়নি ওরা। প্রথম যে জঙ্গলে দেখা হয়েছিল সেখানেই যায়। সুচেতা সবটা বলে দীপেনকে। শুনে চুপ করে থাকে ও। পায়ের তলার মাটি তখনও শক্ত নয় যে!

সুচেতা দীপেনের থেকে কথা আদায় করে নেয়, ও পড়াশোনা শেষ করবে। কথা দেয় দীপেন। আর যোগাযোগ না রাখারও কথা আদায় করে। কারণ সুচেতা বুঝে গিয়েছিল, পরিবারের বিরুদ্ধে এখনই যাওয়াটা সম্ভব নয়। দীপেন অবশ্য বলেছিল, অপেক্ষা করবে। সুচেতা ভেবেছিল, কয়েক বছর পর ও ঠিক দীপেনের কাছে চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎই বাবা মারা যাওয়ায় মা, ভাইয়ের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে ওর কাঁধে। তার পর থেকে আর নিজের কথা ভাবার সুযোগই পায়নি।

সেই যে ফিরেছিল, আর পাকিয়ং যায়নি সুচেতা। বাবা তার পরেও বার কয়েক গিয়েছিল। এয়ারপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিমান ওঠানামাও শুরু হয়েছে। যদিও পাহাড়ের আবহাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। খবরে দেখেছে সুচেতা। বাবাও বিমান ওঠানামা দেখে যেতে পারেনি।

ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়েছে। মায়ের দায়িত্ব এখন ওরই। সব কর্তব্য সামলে চলেছে। শুধু মাঝে মাঝে এক জন কাছের মানুষের ফাঁকা জায়গাটা নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তখন খুব দীপেনকে মনে পড়ত। ভাবত, ও

নিশ্চয়ই সংসার পেতেছে। কত দিনই বা অপেক্ষা করবে!

৮

দেখতে দেখতে তিন দিন পাকিয়ংয়ে কাটিয়ে ফেলেছে সুচেতা। কত দিন থাকবে কোনও প্ল্যান করে আসেনি। মা বার বার ফোন করে জানতে চাইছে, কবে ফিরবে। ভাই জানতে চেয়েছে এক বার দীপেনের কথা। বলতে ইচ্ছে করেনি সুচেতার, এড়িয়ে গিয়েছে।

আজ ব্রেকফাস্টটা ঘরেই আনিয়ে নিয়েছিল। খেতে খেতেই মোবাইলটা বেজে ওঠে। দীপেনের। আগের দিনই নম্বর দিয়েছিল ওরা একে অপরকে।

ও পাশ থেকে দীপেন বলে, ''তোমার আরও দুটো স্বপ্নকে দেখবে না?''

সুচেতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। লামার পোশাক ছেড়ে সাধারণ প্যান্ট, টি-শার্ট পরেছে দীপেন। সেই সাধারণ ছেলেটাকে আবার দেখতে পাচ্ছে ও। এই ক'দিনেই সুচেতা জানতে পেরেছে, দীপেনের বাবা-মা দু'জনেই মারা গিয়েছেন ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওরা শিলিগুড়িতে থাকে। যে বাড়িতে ওরা থাকত সেটা কী করেছে, জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছু বলেনি দীপেন।

হাঁটতে হাঁটতে পুরনো সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। চেহারা অনেকটাই বদলেছে। ভিতর থেকে বাচ্চাদের কিচিরমিচির ভেসে আসছে। থমকে যায় সুচেতা, ''স্কুল!'' দীপেন বলে, ''তোমার স্কুল। বাচ্চারা যে যা পারে টাকা দেয়। আমরা এসে পড়িয়ে যাই। বাচ্চাদের টাকা দিয়ে ওদের জন্যই বই, খাতা কেনা হয়।'' ক্লাস ঘরে যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁরা সকলেই লামা। কেউ টাকা নেন না পড়ানোর জন্য। স্কুলের নাম, ''অ্যাবোড অব লভ'।

স্কুল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা দু'জন। সুচেতা জিজ্ঞেস করে, ''আর একটা কী স্বপ্ন?''

দীপেন বলে, ''তাঁর জন্য গ্যাংটক যেতে হবে।''

পর দিন গ্যাংটকের একটি বড় স্কুলের হস্টেলের সামনে সুচেতাকে দাঁড় করিয়ে ভিতরে যায় দীপেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে দীপেনের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে সুচেতা। ওর বুঝতে আর একটুও সময় লাগে না। সেই যে মেয়ে দত্তক নেওয়ার কথা বলত সুচেতা, সেটাও মনে রেখেছে দীপেন!

সুচেতাকে দেখিয়ে বাচ্চাটিকে দীপেন জিজ্ঞেস করে, ''বল তো এটা কে?'' মেয়েটি আদো আদো গলায় উত্তর দেয়, ''মা''। সুচেতার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা। জড়িয়ে ধরে মেয়েকে। দীপেন মুখ লুকিয়ে চোখ মোছে, দেখতে পায় সুচেতা। ওখান থেকে ওরা তিন জন এমজি মার্গে যায়। মেয়ের জন্য অনেক শপিং করে সুচেতা। আবার ওকে হস্টেলে ছেড়ে দিয়ে ওরা ফেরে পাকিয়ং।

ফেরার পথে সুচেতাকে দীপেন বলে, ''ওকে জন্ম দেওয়ার পরেই ওর মা মারা যায়। বাবাটা মাতাল। ওর পরিবারে তেমন কেউ আর নেই। এলাকার লোকেরা বাচ্চাটাকে অনাথআশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছিল। তখনই তোমার স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল। সবার অনুমতি পেলাম। সবার সমর্থনে ওকে দত্তক নিতে পেরেছি। না হলে একা পুরুষকে মেয়ে দত্তক দেওয়ার নিয়ম নেই। ওর স্কুলের কাগজপত্রে মায়ের জায়গায় তোমার নাম লেখা আছে। তোমার ছবিও রাখা আছে ওর কাছে।''

দীপেন ওকে এ ভাবে মাতৃত্বের সুখ দেবে কখনও ভাবেনি সুচেতা।

৯

আজ যেন সব পেয়েছির দেশে রয়েছে সুচেতা। এত সুখ ওর জন্য সাজিয়ে রেখেছে দীপেন! ভাবতেই পারেনি। ভালবাসা তো এত দিন ওকে বার বার আঘাতই করেছে। এই ছেলেটা কী দিয়ে তৈরি? নিজেকেই প্রশ্ন করে সুচেতা। আর সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে হয় না। যা ১৩ বছর আগে পারেনি আজ যে সেটা তাকে পারতেই হবে। দীপেনের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য এটা না করে ও পারবে না। আজ ও শুধু নিজের কথা ভাববে। অনেক ভেবেছে সবার কথা। এ বার সুচেতা ভাল থাকতে চায়।

গ্যাংটক থেকে পাকিয়ংয়ের হোটেলে সুচেতাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায় দীপেন। বলেছিল, ''তুমি আমাদের বাড়িতে থাকতে পার।'' কিন্তু দীপেনকে ছাড়া থাকতে হবে যে, একা একা! সেটা ভেবে কষ্টটা আর বাড়াতে চায়নি সুচেতা। দীপেন বলেছিল, ''আমি সামনেই মনাস্ট্রির কোয়ার্টারে থাকব, ভয় নেই। দরকার হলে ফোন করবে।'' সুচেতা বলেছিল, ''একেবারে এসে থাকব।''

''একেবারে?''

''হ্যাঁ। কেন? থাকতে পারি না? এখানেই তো থাকার কথা ছিল আমাদের।

''তোমার জন্যই তো রাখা রয়েছে সব, তোমার যা ইচ্ছে।''

''আমার চাকরিটা চলে গিয়েছে। আমি আর নতুন চাকরিতে যোগ দিচ্ছি না।''

''তা হলে কী করবে?''

''কেন? এখানে চাকরি না করলে আমার খাওয়া জুটবে না?''—মিচকি হাসে সুচেতা।

''তা কেন! কিন্তু তুমিই পারবে না কাজ ছাড়া।''— হেসে বলে দীপেন।

সুচেতা বলে, ''ওই স্কুলটাকে আরও বড় করব।''

সম্মতি জানায় দীপেন।

হোটেলে ফিরে রাতেই মাকে ফোন করে সুচেতা। বলে দেয়, ''কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরছি। তার পর সব গুছিয়ে সারা জীবনের জন্য পাকিয়ংয়ে চলে আসব। সেই সব করতে যা সময় লাগবে ততটুকুই থাকব। তুমি চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পারো। না হলে ওখানেই... আমি মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। এ বার তোমার যা ইচ্ছে।''

দীপেনের কথা জিজ্ঞেস করে মা। সুচেতা অস্বীকার করে না। মা-কে জানায়, দীপেন বৌদ্ধধর্ম নিয়েছে। ও ওর জীবন বেছে নিয়েছে, কিন্তু সুচেতার সব স্বপ্নকে পূরণ করে। সেইগুলো নিয়েই এ বার বাঁচবে সুচেতা। দীপেনকে খাতায়কলমে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া হল না এই জন্মে তো কী, ও তো সুচেতার সারা জীবনেরই সঙ্গী।

মাকে ওদের মেয়ের কথাও বলে সুচেতা। মেয়েকে দীপেনের মতো মানুষ করবে। আর যদি ওর জীবনেও একটা দীপেন আসে? মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ভালবাসাকে সমর্থন করবে সুচেতা।

ভাইকেও জানায় ওর সিদ্ধান্তের কথা। সম্মতি জানায় ভাই। বলে, ''এ বার নিজের জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচ। মা থাক আমার কাছে, চিন্তা করিস না। পরে কখনও নিয়ে যাস।''

ভাইয়ের সমর্থন পেয়ে হাল্কা লাগে সুচেতার। মা মনে হয় এখনও মানতে পারেনি। আর তা নিয়ে ভাবতে চায় না ও। এ বার সত্যিই নিজের জন্য বাঁচতে চায় সুচেতা।

১০

পাকিয়ং ছেড়ে কলকাতা— এ বার, মানে এই প্রথম বার বিমানে। বাবার স্মৃতিময় পাকিয়ং এয়ারপোর্ট থেকে টিকিটও জুটে যায় দমদমের। দীপেনই কেটে দিয়েছিল জোর করে। কলকাতা থেকে পাকিয়ং ফেরার টিকিটও ওই কেটে দেবে বলেছে। না করেনি সুচেতা। দীপেন যেমন এখন একাধিক ভাষা বলতে পারে, তেমনই প্রযুক্তিগত জিনিসগুলোও দারুণ বুঝে গিয়েছে। সুচেতার সামনে দাঁড়িয়েই মোবাইল থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে টিকিট কেটে দিল।

সুচেতা বলে, ''এত কিছু পারো তুমি?''

দীপেনের জবাব, ''তুমি পছন্দ করতে তো... তাই পারতেই হত। দেখো কাজে লেগে গেল।''

এ ক'দিনে সুচেতা জেনেছে, স্নাতকপাঠ শেষ করে সিকিম সরকারের চাকরিতে ঢুকেছিল দীপেন। পাশাপাশি স্নাতকোত্তর পড়াশোনাও করছে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ বছর চাকরি করেছে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য দ্রুত প্রোমোশনও পেয়েছে ও। মোটা টাকা মাইনে পেয়েছে। কিন্তু নিজের জন্য যে কোনও খরচই নেই, তা ওর জীবনযাত্রা দেখলেই বোঝা যায়। সেই টাকা দিয়েই তিল তিল করে সব বানিয়েছে দীপেন। বাকিটা জমিয়ে রেখেছে মেয়ের কথা ভেবে।

দু'বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে নিয়েছে। তখন ও একবারে অনেকটা টাকা পেয়েছে। সবই রাখা আছে।

সুচেতা সেই সময়ে বলত, ''একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হবে। সেখানে প্রতি মাসে আমরা টাকা জমাব, কেমন! আর বছরের শেষে সেই টাকা দিয়ে একটা বড় ট্যুর করব।'' জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হয়নি। কিন্তু, একাই টাকা জমিয়েছে দীপেন। বড় ট্যুর আর হবে না। তবে সুচেতার কাজে লেগে যাবে সেই সব। মনে মনে এ সবই ভাবে দীপেন। সুচেতা চাইলে ভেষজ মেডিসিনের কাজটাও শুরু করতে পারে ওরা।

চাকরি ছাড়ার পর অনেক দিন ধর্মশালায় বৌদ্ধধর্মের পাঠ নিয়েছে দীপেন। সেখান থেকে ফিরেই কার্তোক গুম্ফার দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের কাঁধে। পাকিয়ংয়ে আরও দুটো গুম্ফা রয়েছে। কিন্তু কার্তোক দীপেনের মনের একেবারে কাছের। ওখানে সুচেতা বাস করে। বৌদ্ধধর্মে ভালবাসায় কোনও বাধা নেই।

কার্তোক গুম্ফা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। পড়াশোনার জন্য তিব্বতও ঘুরে এসেছে দীপেন। ও এখন মনে-প্রাণে বুদ্ধের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

সুচেতা কলকাতা ফিরে দ্রুত সব গুছিয়ে নেয়। বিশেষ কিছু নেবে না। শুধু জামাকাপড়, ল্যাপটপ, ডেস্কটপটাও নেবে। আর প্রিয় কিছু বই। নিজের ব্যাঙ্কের বইগুলো আর একবার আপডেট করিয়ে নিয়েছে। ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেটগুলো কাছে রাখে। নবনীতার বইমেলা সংখ্যার জন্য গল্পটা কলকাতায় ফিরে ই-মেল করে দিয়েছে। বড় প্রকাশনা সংস্থা থেকেও উপন্যাস লেখার আর্জি এসেছে। একটু সময় চেয়ে নিয়েছে। পাকিয়ংয়ে গিয়েই লেখা শুরু করবে। আর প্রথম বইটা ও উৎসর্গ করবে বাবাকে। বাবার জন্যই তো সেই সময় দীপেনকে পেয়েছিল। আর হারানোটা... সেই কথা আর ভাবতে চায় না। মনে মনে ধন্যবাদ দেয় বাবাকে।

এক ফাঁকে দিল্লি গিয়ে সেখানকার বাড়িটা ছেড়ে এসেছে। দেখাও করে এসেছে সবার সঙ্গে। ভাই, বন্ধু, সহকর্মী, কাছের-দূরের মানুষ... কারও উপরে আর কোনও ক্ষোভ নেই। কোনও অভিমান নেই। রাগ নেই। অদ্‌ভুত একটা শান্তি, যা বহু দিন পায়নি সুচেতা। সব ভালর মধ্যেও সব সময় কী একটা খচখচ করত। আজ বুঝতে পারছে, কেন।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে দীপেনকে কল করে, ''সোমবারের টিকিট আছে কি না দেখবে?''

''দেখছি... আছে।''

কিছু ক্ষণের মধ্যেই সুচেতার মেলবক্সে তাঁর জীবনের ঠিকানা লেখা ই-মেলটা পৌঁছে যায়।

কবিতা

লোভী

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

তখন থেকে আমার দিকে
তাকিয়ে আছো কেনো?
লোভীর মত এত দেখেও
মন ভরেনা যেন!

কখনো পেট দেখছো টিপে
নিচ্ছো পিঠের মাপ,
কতক্ষণ আর মালিক আমার
থাকবে চুপচাপ?

পরখ করতে হলে বাবু
তুলতে হবে ঘরে,
উল্টে পাল্টে খেয়ো তখন,
মনের মত করে।

বংশ আমার জানতে হলে,
দেখতে হবে চেখে,
অসৎ লোকে জগত ভরা,
যায় না চেনা দেখে।

(বাঙালির ইলিশ কেনা)

প্রণালী

মালপোয়া

ঝর্ণা সিংহ

উপকরন:

- ময়দা - ২০০ গ্রাম
- আটা - ২ টেবিল চামচ
- চিনি - ৫০০ গ্রাম
- ঘি - ১০০ গ্রাম
- তেল - ৫০০ গ্রাম
  (ঘি ও তেল মিশিয়ে নিতে হবে)
- কিসমিস - ১০০ গ্রাম
- নারিকেল -আধ খানা কুরে নিতে হবে
- মৌরি গুঁড়ো - ১ টেবিল চামচ
- ছোট এলাচ - 2 টা
- বড় এলাচ - ১ টা
  (এলাচ খোলা ছাড়িয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে)
- দুধ - ১/২ লিটার

পদ্ধতি

ময়দাতে ২ চামচ আটা মিশিয়ে ৫-৬ চামচ তেল ভালো করে মেশাতে হবে। এরপর আন্দাজ মতো দুধ দিয়ে ময়দাটাকে গুলতে হবে. দেখতে হবে যেন বেশি পাতলা না হয়ে যায়। এরপর এতে নারকেল কোরা, মৌরি গুঁড়ো ও কিসমিস মেশাতে হবে।

বড় কাপের ১ কাপ জলে চিনি মিশিয়ে রস করে আলাদা একটা বড় পাত্রে রাখতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে একটা বড় গোল হাতা দিয়ে যে গোলা তৈরী করা আছে তার থেকে এক হাতা করে নিয়ে গরম তেলে ভেজে বাদামী রঙ হলে রসে ফেলতে হবে। গরম গরম মালপোয়া অত্যন্ত মুখরোচক। ঠান্ডা অন্যরকম অপূর্ব।

প্রণালী

গোকুল পিঠে

ঝর্ণা সিংহ

উপকরন:

- ২০০ গ্রাম ময়দা
- ২০০ গ্রাম চিনি
- ৫০০ গ্রাম দুধ
- ৫০০ গ্রাম চিনি রস করার জন্য
- ১ টা নারিকেল
- ১/২ চা চামচ ছোট এলাচের গুড়ো
- 2 কাপ মতো জল
- ৮-১০ চা চামচ ময়াম এর জন্য সাদা তেল
- ভাজার জন্য তেল আলাদা

পদ্ধতি

প্রথমে নারিকেল্ টা কুড়ে নিতে হবে। নারিকেল কোরা টা মিক্সি তে একটু পেস্ট করে নিতে হবে। এবার এই পেস্ট টার সঙ্গে খোয়া ক্ষীর ও চিনি ২০০ গ্রাম মতো মেশাতে হবে। কড়াই গাসে বসাতে হবে। এবারে নারিকেলের পুরটা তার মধ্যে দিয়ে নাড়তে হবে। শক্ত মতো হোলে বা কড়আই থেকে ছেড়ে এলে বুঝতে হবে পুর রেডী। এবারে ছোটো এলাচের গুড়ো মেশাতে হবে।

ময়দাটাকে ময়াম দিয়ে মেখে নিতে হবে। তারপর এই শুকনও ময়দার মধ্যে কুসুম কুসুম গরম দুধ দিয়ে ঘন করে গুলতে হবে। নারিকেলের পুরটা ছোট ছোট গোল বলের আকারে গড়িয়ে নিয়ে দুটো হাতের তালুতে চেপ্টে নিতে হবে। গড়াবার সময় হাতে একটু জল লাগিয়ে নিলে গড়ান ভালো হয়। কড়াই তে ভাজার জন্য অনেকটা তেল নিতে হবে। তেল গরম হলে চ্যাপ্টা আকারে গড়ানো পুরটাকে ময়দার গোলায় ডুবিয়ে ভাজতে হবে। অপরদিকে একটি পাত্রে জল ও চিনি ফুটিয়ে ঘন রস করে নিতে হবে। পিঠে গুলো হাল্কা ব্রাউন করে ভেজে চিনির রসে ফেলতে হবে। রসে ভিজে গেলে পিঠেগুলো রস থেকে তুলে নিতে হবে।

NB: খোয়া না পেলে কনডেন্সড মিল্ক, ফ্রেশ নারিকেলের বদলে ডেসিক্যাটেড কোকোনাট নিলেও চলবে। তখন পুর তৈরীর সময় চিনি একটু কম মেশাতে হবে ।

প্রবন্ধ

দুর্গোৎসবের পরিবর্তন

শৈলেন্দ্রনাথ মৈত্র

আজ আগমনীর আবাহনে কি সুরে উঠিছে বেজে

দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই ধরণী উঠিল সেজে।

ঋতুর আবর্তনে ফিরে ফিরে আসে শরৎকাল। বর্ষার কালো মেঘ বিদায় নেয়, শরতের নীল আকাশে উজ্জ্বল আলোয় সাদা মেঘের দল নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করে । নদীর শুকনো চড়ায় কাশফুলের সমারোহ। প্রকৃতি যেন নব সাজে সেজে ওঠে। সর্বত্র হাসি আর আনন্দ । এই আনন্দময় পরিবেশে মা দুর্গার আগমন ঘটে। কৈলাসবাসিনী মা দুর্গার আগমন এবং প্রস্থান, পৌরাণিক ঘটনা এখানে আলোচ্য বিষয় নয় । মর্তের মানুষ কবে দশোভূজা রূপে মায়ের পূজা আরম্ভ করে, সে বিষয়ে পন্ডিতের মধ্যে মতভেদ আছে । আজকের পূজার আয়োজন দেখে দুইশত বৎসর আগে উৎসবের রূপ কেমন ছিল তা কল্পনা করা সম্ভব নয় । যুগে যুগে মায়ের মূর্তির পরিবর্তন না হলেও, আয়োজন ও সাজ সজ্জার পরিবর্তন হয়েছে।

পৌরাণিক যুগে রাজা সুরথ দেবী চণ্ডীর আরাধনা করেন । মারকন্ড পুরানে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে । তারপর বহু যুগ কেটে গেছে, শক্তির আরাধনায় নানা পরিবর্তন এসেছে । পূর্ব ভারতে , বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে কবে এবং কিভাবে মা দুর্গার বর্তমান রূপে পূজা অর্চনা আরম্ভ হয়েছে, তার নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে । বর্তমানে যে রূপে মাতৃ বন্দনা হয় , তার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে । ইংরেজরা এ দেশের শাসক হবার পর এদেশে প্রথমে ভূমি সংস্কার হয় । সারা দেশের সকল জমির মালিকানা কয়েকজন জমিদারের হাতে চলে আসে । এই জমিদার শ্রেণী সকল জমির মালিক হয়ে বসে এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। ফলে তারা প্রচুর অর্থ এবং নানা সম্পদের মালিক হয়ে বসে । এই জমিদার শ্রেণী ছাড়াও জোতদার , নায়েব , গোমস্তা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং তারাও প্রচুর অর্থশালী হয় । এই ধনী শ্রেণী নব রূপে মা দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হয় ।

শরতের মনোরম আবহাওয়ায় একদিকে যেমন প্রকৃতি সেজে ওঠে, অন্যদিকে বঙ্গ সমাজে বিত্তশালী পরিবারের পুজোয় সকল সমাজ যুক্ত হয় । পরে শুধু পারিবারিক পুজোর মধ্যেই এই আয়োজন সীমাবদ্ধ থাকে না, এটা সর্বজনীন রূপ পায় - বলা হয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব । সমগ্র দেশ এই উৎসবে মেতে ওঠে । ধনী দরিদ্র সকলে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে । একের মা দুর্গা সবার দ্বারা পূজিত হয়ে ভক্তজনের মনোবাসনা পূর্ণ করেন ।

বহুদিন সমাজে এই প্রথাই প্রচলন ছিল। কারো কোন অনুযোগ ছিল না । সমাজের দরিদ্র মানুষ জমিদার বাবুর দেওয়া একখানা ধুতি বা শাড়ি মাথায় তুলে নিয়ে তার জয়ধ্বনি দিত আর ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হতো এবং বিমল আনন্দ উপভোগ করতো । পরবর্তীকালে দেবী বনেদি পরিবারের ঠাকুর দালানের বাইরে এসে ব্রাত্যজনের দ্বারা পূজিত হলেন, আরম্ভ হলো বারোয়ারি পূজা । বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গভূমির হুগলি জেলায় গুপ্তিপাড়ায় প্রথম বারোয়ারি পূজা আরম্ভ হয় । বারো জন 'ইয়ার' অর্থাৎ বন্ধু মিলে এই পূজা হয়েছিল, তাই নাম দেওয়া হয় বারো-ইয়ারি সংক্ষেপে বারোয়ারি পুজো । ক্রমে ক্রমে এই বারোয়ারি পূজো দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে । বনেদি বাড়ির নাট মন্দির ছেড়ে মা ধুলামন্দিরে নেমে আসেন। মানুষ মাকে আরো আপন করে পায় । দেবস্থানের অন্তরে যাদের প্রবেসাধিকার ছিল না , তারাও মায়ের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায় । দেবী আরাধনা প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন রূপ পায় ।

প্রথম ভাগে এইসব বারোয়ারি পূজোতে মায়ের পুজোর আচার নিয়ম নিষ্ঠার কোন খামতি ছিল না। মানুষ ভক্তি ভরে দেবীকে প্রণাম করে নিজের মনোবাসনা মায়ের কাছে নিবেদন করেছে । একটা পবিত্র পরিবেশে মায়ের পূজো নিস্পন্ন হত। এত সজ্জার ঘটা ছিল না ,আলোর রোশনাই ছিল না । প্রদীপের আলোয় মাতৃ বন্দনা হয়েছে, শ্রদ্ধাভক্তির কোন কমতি ছিল না। ধনী দরিদ্র সবাই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী পূজায় অংশগ্রহণ করেছে , আভিজাত্যের অহংকার এত পীড়াদায়ক হয়নি ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতায় প্রথম বারোয়ারী পুজোর সূচনা হয় । গ্রামাঞ্চলে এবং জেলা শহর গুলিতে দুর্গাপূজা পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কলকাতার বাগবাজার ও কুমারটুলিতে প্রথম বারোয়ারি পূজা আরম্ভ হয় । সেই সময় পূজার আঙ্গিকে কিছু কিছু শহুরে কালচারের ছাপ লাগে । একবার বাগবাজার সার্বজনীন পূজার উদ্বোধনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কে আমন্ত্রণ করা হয় । যথাসময়ে আচার্য পূজা মন্ডপে উপস্থিত হয়ে চারিদিকের মন্ডপসজ্জা এবং মায়ের সাজ সজ্জা নিরীক্ষন করে পূজার কর্মকর্তাদের ডেকে বলেন, মায়ের পূজাতে তোমরা ফ্যাশান ডেকে আনলে । কিন্তু ফ্যাশন তো এখানেই থেমে থাকবে না , তখন পূজা অর্চনা ভক্তি আবেগ আকুলতা এসব অন্তর্ধধান করবে, শুধু ফ্যাশান ই থাকবে। মাতৃ বন্দনার উদ্দেশ্য তা নয় । এই কথা বলে হতাশাগ্রস্ত আচার্য মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে, প্রস্থান করেন । প্রায় একশত বছর পূর্বে আচার্য তার ঋষিদৃষ্টি দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন , আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে । ধীরে ধীরে বারোয়ারী পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গঞ্জে বারোয়ারী পুজোর আয়োজন করা হয় । সেখানে বিশাল আয়োজন । মন্ডপ সজ্জা ,আলোর রোশনাই, ঝাড়বাতির প্রতিযোগিতা -শুরু হয় । শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভক্তের মনের আকুলতা- ম্লান হয়ে যায় ।

অর্ধ শতাব্দি পরে ,সেই আয়োজনের পরিবর্তন হয় । ফুল, বেলপাতা, ধূপ ধুনা দিয়ে দেবীর পূজা গৌণ হয়ে পড়ে , বাইরের সাজসজ্জাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় । বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে, দক্ষিণ কলকাতার এক সার্বজনীন পূজা মন্ডপে দেখা গেল কোন এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে মায়ের মূর্তি ঢাকা পড়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় সেই ব্যবসায়ী নাকি পুজোয় ভালো পরিমানে অর্থ দান করেছে । তাই মন্ডপে এত বিজ্ঞাপনের আধিক্য । সেই সময় থেকেই শারদীয়া পূজায়, পূজার আঙ্গিনায় বর্তমান সভ্যতার নিদর্শন- কর্পোরেট সেক্টরের আগমন ঘটে । পরবর্তীকালে দেখা গেল, প্রায় সকল বারোয়ারি পূজা এই বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টরের আর্থিক সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এই পরিবর্তন দেখে এক প্রবীণ নাগরিক মন্তব্য করেছিলেন – These are the shape of the things to come. মা দুর্গা এখন বিজ্ঞাপনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন । কখন মা নিজেই কোম্পানি উৎপাদিত পণ্যের মডেল হয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছেন । প্রবল শক্তিধর সিংহ মায়ের রূপান্তর দেখে ভগ্ন মনোরথ হয়ে লেজ গুটিয়ে এক পাশে বসে আছে ।

চারদিকে আলোর রোশনাইতে চোখ ধাঁধায় । সুসজ্জিত দর্শকেরা কলের পুতুলের মত মণ্ডপে মন্ডপে ঘুরে রাত্রির শেষ প্রহরে রেস্তোরায় বসে বিদেশি খাবার আস্বাদন করে শারদ উৎসবের বিমল আনন্দ উপভোগ করে। নেই মাতৃ বন্দনা , নেই ভক্তি, নেই আবেগ আকুলতা । সবই একটা কৃত্রিম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে । আগামী দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর যুগে, সমগ্র উৎসবটাই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হবে । কোন প্রাণের পরশ থাকবে না । মানুষ ও যন্ত্রে পরিণত হবে । যন্ত্রই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে । আর যান্ত্রিক মানুষ সেই যন্ত্রের কেরামতি দেখে, দেতো হাসি হেসে দেবস্থান হতে প্রস্থান করবে । হয়তো তখন 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ ও সংস্থিতা' না বলে বলবে – ' 'যা দেবী সর্বভূতেষু এ আই রূপেণ ও সংস্থিতা' । লক্ষ্মী সরস্বতী আইফোন হাতে নিয়ে রোবট সদৃশ্য দ্বিপদ প্রাণী মানুষের কৃত্রিম রঙ্গ তামাশার ছবি তুলে কৈলাসে নিয়ে যাবে । মনের দুঃখে মা দুর্গা গঙ্গার জলে অবতরণ করবেন। তাও হবার নয়, সেখানে নানা নিষেধ আছে ।

সনাতন ধর্মের আবেদন বিশ্বব্যাপী । কোন একটা নির্দিষ্ট গন্ডী বা নির্দিষ্ট মনুষ্য সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নয় । এর আবেদন বিশ্বজনীন । বহুজন সুখায় ,বহুজন হিতায়চ । সেখানে প্রকৃতিকেও বাদ দেওয়া হয়নি । বলা হয় 'ওঁ দ্যৌঃ শান্তি রন্তরিক্ষং শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তি' । প্রকৃতির কাছে মানুষ বড় অসহায় ,সে বাঁচতে চায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তাই তার কাতর আবেদন। সে শান্তি চায় এবং সে শান্তি শুধু নিজের জন্য নয় । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকুলের মঙ্গল কামনা করে সে শান্তি । দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতবিক্ষত গৃহবাসী মানুষ তার সকল দুঃখ ব্যথা বেদনা অকপটে মায়ের চরণে নিবেদন করে তার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে । গভীর সংকটের মাঝে মাকে স্মরণ করে মানসিক শক্তি অর্জন করে পুনরায় জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয় । এইভাবেই যুগ যুগ ধরে মানুষ বেঁচেছে , আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে । আজ সেই প্রথার পরিবর্তন হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ দেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল - আজ মানুষ তথা সমাজ সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে । এটা কাম্য নয়। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মানুষের আত্মিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার ফলে মানুষ শুধুমাত্র সর্বহারা হচ্ছে তা নয়, তার কাঙ্খিত বস্তুও অধরা থেকে যাচ্ছে ।

Sponsored by

AK TRADE HOUSE

AK EXPORT & IMPORT AB

STOCKHOLM SARBOJONIN PUJA COMMITTEE

© Copyright Likhon 2023

Likhon 2016
SSPC'S YEARLY PUJA MAGAZINE

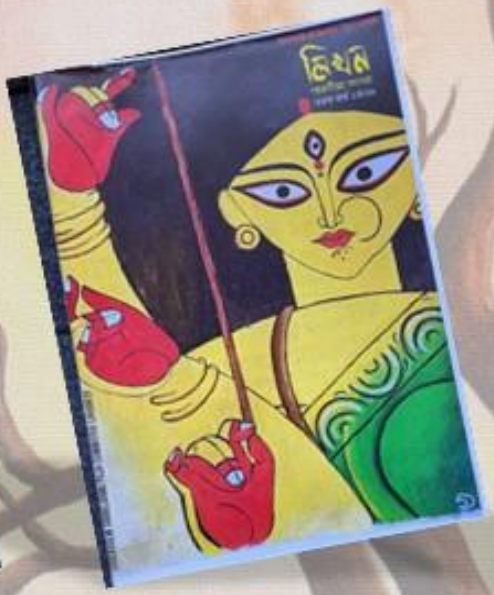

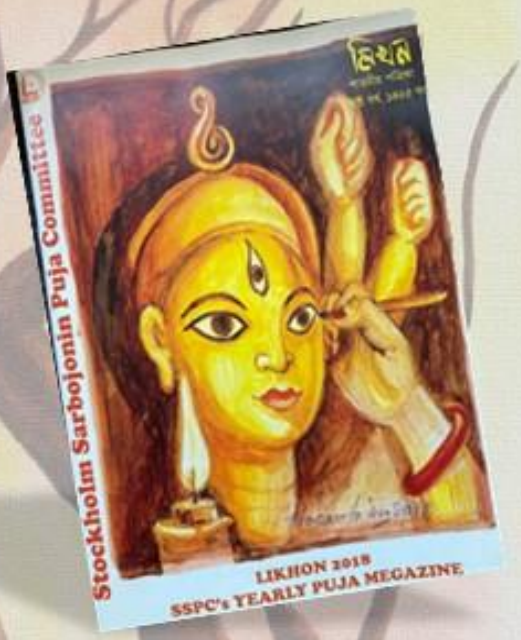
Stockholm Sarbojonin Puja Committee
LIKHON 2018
SSPC's YEARLY PUJA MEGAZINE

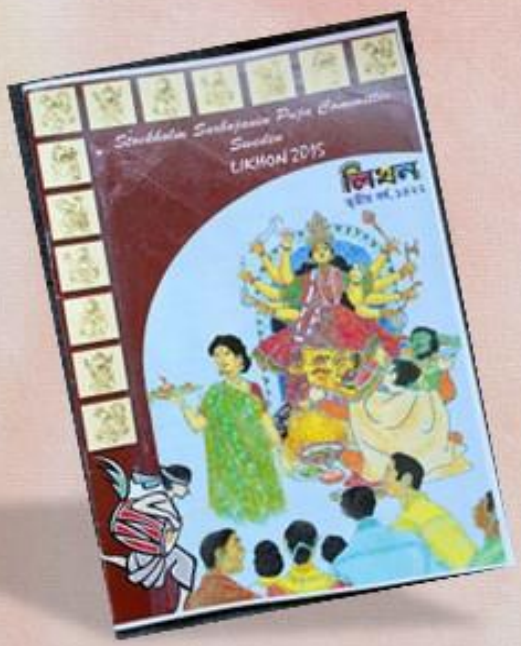
Stockholm Sarbojonin Puja Committee
Sweden
LIKHON 2015

লিখনের ১১-এ পা

Stockholm Sarbojonin Puja Committee
LIKHON 2017
SSPC's YEARLY PUJA MEGAZINE